APRIL 2023

Monthly Bulletin

VOLUME LII, NO. 4

THE ASIATIC SOCIETY
(AN INSTITUTION OF NATIONAL IMPORTANCE)
1 PARK STREET ● KOLKATA-700016

Cover Description

A plaque in front of the house where Sir William Jones lived till his death on 27th April 1794. He was buried in South Park Street Cemetery. The house is now situated inside the compound of the headquarters of the South Eastern Railway (formerly the Bengal Nagpur Railway).

Contents

From the Desk of the General Secretary 1

Meeting Notice 2

Paper to be Read

- লিপি-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা 3
  বিশ্বনাথ রায়

President's Column

- Civil Society, State and Democracy 9

Tribute on Birth Anniversary

- An Overview of Dr. B. R. Ambedkar's Ideas of Education and its Relevance in the Present Indian Situation 13
  Bankim Chandra Mandal

Indo-Poland Confluence

- Welcome Address 21
  Satyabrata Chakrabarti
- Inaugural Address 23
  Adam Burakowski
- Katowice and Upper Silesia : The Modern Adventure 24
  Łukasz Galusek
- Emerging Perspectives in the Study of Cultural Significance of the Ancient Cities: A Brief Note on Varanasi 29
  Binda Paranjape

Remembering Surendranath Kar

- অনন্য প্রয়োগশিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর 36
  অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

On Environment

- Deltaic Women of Bengal Reimagining the Forest Rights Act, 2006 (India) 41
  Amrita Dasgupta

Tribute on 125 Years

- সুকুমার সেন : ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের বিস্মৃত স্থপতি 46
  নিলয়কুমার সাহা

Treasures of The Asiatic Society

- Tibetan Collection of The Asiatic Society 51
  Archana Ray

Events

- Asiatic Society's Exhibition on Rare Manuscripts at the 46th International Kolkata Book Fair, 2023 55
- Celebration of National Science Day 57

Books from Reader's Choice

- *আহমদ শরীফ রচনাসমগ্র* (প্রথম খণ্ড) 58
  স্মৃতিকণা চক্রবর্তী

Books Processed during the Last Month 64

From the Desk of the General Secretary

Dear Members and Well-wishers,

You will kindly remember that 230th death anniversary of our Founder, Sir William Jones falls on 27th April, 2023. Further, historical connectivity of the Asiatic Society is revealed in this month by the facts of the establishment of the institutions like Calcutta Medical College and Indian Museum, which started functioning on April 1, 1839 and 1878 respectively. When we are operating in the structure of digital India, we obviously remember that the computer was introduced in India on April 3, 1966. India's march in the field of space was marked by the incidence when the first Indian Shri Rakesh Sharma went to outer space on April 4, 1984. The World Health Organization (WHO) was founded on April 7, 1948. We still remember the horrified day of April 13, 1919 when the massacre of Jalianwala Bagh was executed. Our next door neighbour Bangladesh declared its independence and the formation of Provisional Government on April 17, 1971.

The month of April appears to be very ceremonious when we come to know about the birth of so many luminaries of the world in various fields of specializations. I am not going to put it here by name excepting Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar (*b.*14 April 1891), an Indian jurist, economist, social reformer and political leader who headed the Committee of drafting the Constitution of India. Rather I mention that the month of April is equally memorable because of certain negatively poised incidences. For example, the leader of French Revolution Georges Jacques Danton was guillotined on April 5, 1794. Abraham Lincoln was assassinated on April 14, 1865. On the same day of 1930 Vladimir Mayakovsky committed suicide. Adolf Hitler committed suicide on April 30, 1945. Martin Luther King (Jr.) was assassinated on April 4, 1968 while on the same day of 1979 Zulfikar Ali Bhutto was hanged. Benito Mussolini was executed on April 28, 1945.

Friends, during this period under report, a number of academic programmes were organized at the Society. For example, an art exhibition on "A few visionaries of the world – Thread on Canvas" was organized in collaboration with Rekha-Chitram at Rajendralala Mitra Bhavan, Salt Lake, Kolkata during 22-28 February, 2023. National Science Day was organized on 28th February, 2023 and on this occasion an exhibition on Sir C. V. Raman was organized. Raja Rajendralal Mitra Memorial Lecture, 2021 was organized on 10th March, 2023 on line and Professor Gaya Charan Tripathi, Eminent Indologist and Sanskrit Scholar, delivered the lecture on "Traces of Buddhist Thoughts in the Bhagavad Gita". I had attended a meeting of PAC subcommittee-I, regarding the compliance of ATN with regard to excess contribution of employees' provident fund (Para 6.2) on 17th February, 2023 at Parliament House Annex, New Delhi. A study visit by six officials of the Lok Sabha Secretariat, working in the Parliament Library, was made at the Asiatic Society on 3rd March, 2023 and exchanged their views with our library staff and officers.

Dear Members, please continue to take part in all academic programmes of the Society including the Monthly General Meeting and provide us with your suggestions for any improvement as you deem fit to run such an Institution of National Importance in future.

Please keep well and safe.

(S. B. Chakrabarti)
General Secretary

Tomb of
Sir William Jones in
the South Park Street
Cemetery

AN ORDINARY MONTHLY GENERAL MEETING OF THE ASIATIC SOCIETY WILL BE HELD ON MONDAY, 3RD APRIL 2023 AT 5 P.M. AT THE VIDYASAGAR HALL OF THE SOCIETY

MEMBERS ARE REQUESTED TO KINDLY ATTEND THE MEETING

AGENDA

1. Confirmation of the Minutes of the last Ordinary Monthly General Meeting held on 6th March, 2023.
2. Exhibition of presents made to the Society in March, 2023.
3. Notice of Intended Motion, if any, under Regulation 49(d).
4. Matters of current business and routine matters for disposal under Regulation 49(f).
5. Consideration of reports and communications from the Council as per Regulation 49(g).
6. The following paper will be read by Professor Biswanath Roy :
   "*Lipi-Shilpi Rabindranather Hater Lekha*"

1 Park Street, Kolkata-700016
Dated : 20.03.2023

(Asok Kanti Sanyal)
General Secretary (Acting)

লিপি-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা

বিশ্বনাথ রায়
প্রাক্তন অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপির বিচার-বিশ্লেষণ করে তাঁর মনের গহনে প্রবেশ-সূত্রে কবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ধারণ করা, ইংরেজিতে যাকে বলে গ্রাফোলজি (Graphology); রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরের সে-দিকটা নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করেছেন বিশেষজ্ঞজন। জটিল সেই ব্যাপার পরিহার করে আমরা দেখতে ও দেখাতে চাই কবির হস্তলিপি, সোজা কথায় তাঁর হাতের লেখার নান্দনিক মূল্যমান কীভাবে আমাদের এই আধুনিক জীবনেও সৌন্দর্য-চর্চার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে প্রতিনিয়ত তাঁর অন্যান্য অমূল্য সৃষ্টিসম্ভারের মতোই।

যে-কোনো শিল্পের উপভোগ্য-জনিত বোধের নাম আনন্দ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সৌন্দর্যের বোধ জাগায়। বাহ্যইন্দ্রিয় এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তার পূর্ণতা হৃদয়ের উপলব্ধিতে। নান্দনিক (Aesthetic) শব্দের অর্থ-ব্যঞ্জনায় প্রধানত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে বোঝালেও সেই চোখে দেখা বস্তুকে বিশুদ্ধ আর্ট হতে গেলে তাকে মনোহারী হতে হয়। ছবি বা চিত্রকলার সঙ্গে হস্তলিপিশিল্পের যোগ এখানেই—উভয়েই বিশুদ্ধ আর্ট। আর শিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এই দুটি ক্ষেত্রেই শুধু চূড়ান্ত সফলতা পায়নি, উভয়ের মধ্যেই চমৎকার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তিনি ডুড্‌লিংস (Doodling's) অর্থাৎ লেখার সময় বর্জিত পাঠ, শব্দ, পঙ্‌ক্তির হিজিবিজি কাটাকুটিকে এক একটা চিত্রের রূপ দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে ডুড্‌লিংসের আঁকিবুকি কাটার স্বতন্ত্র সৃজনশীলতার আবেগ থেকেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আসে ছবি আঁকার তাগিদ। আবার অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে কবি যখন সেই ছবির বিষয়টা দৃষ্টিনন্দন হস্তাক্ষরে লিখে দেন কিংবা ছবির নিচে বা পাশে কোনো অভিনব অপ্রচলিত স্বাক্ষর করেন শিল্পরসিকের কাছে তা হয়ে ওঠে সোনায় সোহাগা।

শৈশব ও বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা খুব ভালো ছিল এমন কথা বলা যায় না। *জীবনস্মৃতি*তে তার স্বীকারোক্তি আছে। কৈশোরের সূচনাপর্বের কাল পর্যন্ত যে 'নীলখাতা', 'লেট্‌স ডায়ারি' প্রভৃতিতে বাল্য-কৈশোরের লেখালেখি, সেসব বিলুপ্তির গহ্বরে তলিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের বয়ানে জানা যায়, —'নীল খাতাটি ক্রমেই বাঁকা-বাঁকা লাইনে ও সরু-মোটা অক্ষরে কীটের বাসার মতো'

ভরে উঠেছিল। 'বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষর'-এর অসমান লাইনের সেসব লেখা কবির বয়সের তুলনায় সুন্দর হওয়ার কথাও নয়।

কৈশোর থেকে প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা কেমন ছিল তা জানতে গেলে আমাদের নজর দিতে হবে এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাচীনতম রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি '*মালতী পুঁথি*'-র প্রতি। এই খাতায় রবীন্দ্রনাথের ১৩ থেকে ২১ বছর বয়স পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি ও নাগরী হস্তাক্ষরে সংস্কৃত লেখার নমুনা আছে। সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি নিরীক্ষণ করলে প্রথম জীবনে কবির হাতের লেখার বিবর্তনটি যেমন স্পষ্ট বোঝা যায় তেমনি ডুড্‌লিংস্ তৈরি ও ছবি আঁকার প্রাথমিক প্রচেষ্টা এমনকি নিজের স্বাক্ষরের মক্‌শো করার প্রমাণও পাওয়া যায়। ডানদিকে হেলে থাকা ছোটো অক্ষরে মোটামুটি সমান লাইনের সে হস্তাক্ষর পাঠযোগ্য হলেও তখনও সুন্দর হয়ে ওঠেনি। অবশ্য অক্ষরগুলি ধীরে ধীরে মাঝারি মাপের হয়েছে।

মোটামুটি ২৫ থেকে ৩০ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা ক্রমশ পরিণত হয়েছে। ডানদিকে কাত হয়ে থাকা অক্ষর অনেকটা সোজা হয়েছে। *মানসী*, *সোনার তরী* কাব্যের পাণ্ডুলিপির ছবি সেকথাই বলে। জীবনের মধ্যপর্বে কবির হস্তাক্ষর আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে। দেখা গেছে *খেয়া*, *নৈবেদ্য*, *গীতাঞ্জলি*, *গীতালি*, *গীতমাল্য*-এর কবিতাগুলি লেখার সময় নিজের লিপিকুশলতা সম্পর্কে কবি যথেষ্ট সচেতন। এই সময় থেকেই শিক্ষিত সমাজে বিশেষ করে বিদ্বজ্জনমহলে তাঁর হাতের লেখার খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ে। বীরভূমের শিশুসাহিত্যিক শিবরতন মিত্র ১৯০৮ সালে ছোটোদের জন্য পরিকল্পিত তাঁর *হস্ত-লিপি লিখন-প্রণালী* (১৩১৫) গ্রন্থের জন্য কবির কাছে 'টানা লেখার আদর্শ' হিসাবে একটা দৃষ্টান্তমূলক রবীন্দ্রলিপি প্রার্থনা করলে তিনি *শিশু* কাব্যের 'ছুটির দিনে' কবিতার প্রথম স্তবকটি সুন্দর করে লিখে দেন। 'ভূমিকা'য় শিবরতন লেখেন—

> বর্তমান সাহিত্যসম্রাট কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের প্রার্থনা মত হস্তলিপির জন্য সমগ্র পৃষ্ঠাব্যাপী একটি স্বরচিত কবিতা স্বহস্তে লিখিয়া দিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। আশা করি, শিশুগণ তাঁহার সুগঠিত অক্ষর ছন্দের অনুবর্ত্তী হইয়া অক্ষরের গঠন রচনা করিবে, কবিবরের এই অনুগ্রহের জন্য আমাদের সহিত বর্তমান এবং ভবিষ্যদ্বংশীয় শিশুগণ চিরঋণে আবদ্ধ রহিবে।

মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি ও বিশ্বকবি হিসাবে খ্যাতিলাভ তখনও পাঁচ বছর দূরে।

পরবর্তীকালে এর ফলে 'ভবিষ্যদ্বংশীয়' ছাত্রসমাজে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা নকল করার ধুম পড়ে যায়। এর ফল হয় মারাত্মক। দু'দুবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণায় বিভ্রাট ঘটে। হুবহু রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় উত্তরপত্র পরীক্ষকদের বিভ্রান্ত করে তোলে। এ বিষয়ে একটি সংবাদ তো ৩১ জুলাই ১৯৩৯ তারিখের *আনন্দবাজার পত্রিকায়* **'রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর অনুকরণে বিপদ/ বি-এ পরীক্ষায় ফেল করার উপক্রম'** শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা শিক্ষিত বাঙালির কাছে কেন আদর্শ হস্তলিপি বলে বিবেচিত হ'ল? এর চমৎকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে *সবুজপত্র* পত্রিকার সম্পাদক বীরবল ওরফে প্রমথ চৌধুরীর লেখায়—

> তাঁর [রবীন্দ্রনাথের] হস্তাক্ষর অতুলনীয়। শাস্ত্রে বলে সেই হস্তাক্ষরই সুন্দর, যার প্রতি অক্ষর সম, সমশীর্ষ, সরল ও বিরল। এই চতুর্গুণ ছাপার অক্ষর মাত্রেই আছে। কিন্তু অধিকাংশ হাতের লেখার নেই।
>
> ছাপার অক্ষরে এসব গুণ থাকতে পারে; সে

> অক্ষর রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরের মত সুন্দর নয়। ছাপার অক্ষরকে এক হিসাবে সাধু অক্ষর বলা যেতে পারে। সাধুভাষা যেমন কৃত্রিম ভাষা, ছাপার অক্ষরও তেমনি কৃত্রিম অক্ষর। বাঙালীর হস্তাক্ষর থেকে তা উদ্ভূত হয়নি। উপরন্তু আমাদের চলতি ছাপার অক্ষরের কোন বৈচিত্র্য নেই।
>
> যন্ত্র কোন মানুষের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না—মুদ্রাযন্ত্রও নয়। ফলে তা হয়ে ওঠে নিতান্ত একঘেয়ে। বিশিষ্টতাই হচ্ছে মানবধর্ম, তাই এই একঘেয়েমি থেকে উদ্ধার পাবার জন্য... যদি রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরের নকল করে সীসের অক্ষর তৈরী হয়, তাহলে ছাপার অক্ষরের নূতন রূপ আমরা দেখতে পাবো। সে নব কলেবরধারী ছাপার অক্ষরও আমাদের চোখে খুব সুন্দর লাগবে। আর কাজ সমানই চলে যাবে।

প্রমথ চৌধুরীর এই ইচ্ছাই কী রবীন্দ্রনাথের হাতে মান্যরূপ পেয়েছিল; নিজের হস্তাক্ষরে নতুন প্রযুক্তিতে ছাপা *লেখন* (১৯২৭) কাব্যে? বইটিতে কোনো টাইপ ব্যবহৃত না হওয়ায় পাঠকের কাছে তা ছিল এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। কাব্যের 'ভূমিকা'য় *লেখন*-এর লেখক জানিয়েছেন—

> এর প্রধান মূল্য হাতের অক্ষরে ব্যক্তিগত পরিচয়ের। সে পরিচয় কেবল অক্ষরে কেন, দ্রুতলিখিত ভাবের মধ্যেও ধরা পড়ে। ছাপার অক্ষরে সেই ব্যক্তিগত সংস্রবটি নষ্ট হয়—...তাই জর্ম্মনিতে হাতের অক্ষর ছাপবার উপায় আছে খবর পেয়ে লেখনগুলি ছাপিয়ে নেওয়া গেল।

চমৎকার হাতের লেখার যে বৈশিষ্ট্যের কথা প্রমথ চৌধুরী বলেছেন তার সবকটিই পরিণত জীবনের রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে আমরা পেয়ে যাই। রবীন্দ্রনাথের লেখার অক্ষরগুলি মাঝে মাঝে ডানদিকে একটু ঝোঁকা হলেও প্রতিটি লাইন কিন্তু সোজা এবং তরঙ্গিত লাইনগুলির ফাঁক একমাপে শৃঙ্খলাবদ্ধ। অক্ষরগুলির গঠন সমমাপের ও সুন্দর টানের আকার-আকৃতির রেখায় মাত্রা দিয়ে যেমন জোড়া তেমনি প্রতিটি শব্দের মধ্যে ব্যবধানও যথাযথ। বাংলা মুদ্রিত অক্ষরমালা প্রায় ক্ষেত্রে কৌণিক। ব, র, ঘ, য় প্রভৃতি অক্ষরে কোণগুলি ভেঙে মোলায়েম অর্ধগোলাকার করে হাতের লেখার গতিকে সৌন্দর্যময় ও চলমানতা দিয়েছেন কবি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরের স্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। অক্ষরগুলির মাপ বা আয়তন মাঝারি থেকে বড়ো হয়েছে; তবে লেখার গঠনশৈলীর মূল রূপটির বিশেষ হেরফের ঘটেনি।

কথায় আছে 'কালি কলম মন/লেখে তিন জন'। লেখার সময় 'মন'-এর অবস্থানগত গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা, শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রভাবে একই সময়কালে হাতের লেখায় গুণগত বৈচিত্র্য আসে। যান্ত্রিক নিয়মে কবির কলম চলেনি বলেই তা প্রাণবন্ত ছন্দস্পন্দনে সচল। জটিল, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের সৃষ্টি কল্পনায় মানসিক চাপের সঙ্গে ভাবের আবেগকে মেলাতে গিয়ে সৃজনশীল রচনায় গ্রহণ-বর্জনের পরিমাণ বেশি হয় বলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা নাটক গল্প-উপন্যাসে কাটাকুটি বেশি। তুলনায় চিঠিপত্রে বস্তুগ্রাহ্য বিষয়ের অবতারণা হয় বলে হাতের লেখা এগিয়ে চলে তরতরিয়ে নির্বিঘ্নে। অন্যপক্ষে যখন নিজের প্রয়োজনে অন্য কারও লেখা কপি করেন মন তখন ভারমুক্ত থাকে বলে হাতের লেখা হয় ঝরঝরে সাবলীল। আবার শুয়ে বা বসে কোনো বই পড়তে পড়তে তার মার্জিনে বা পুস্তানিতে যে-সব ছোট ছোট নোট নেন বা ভিন্ন ভাষার রচনা অনুবাদ করেন তখন কবির হাতের লেখা হয় একটু ভিন্ন ধরনের।

প্রৌঢ় বয়সে নিজের হস্তাক্ষরে চমৎকারিত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যখন নিশ্চিত, নিজের সৃজনশীল রচনার মতোই শিক্ষিত সমাজের আগ্রহ ও কৌতূহল ক্রমবর্ধিত তাঁর সুন্দর

হস্তাক্ষর নিয়ে; হাতের লেখায় ছাপা বই *লেখন* পাঠক-সমাজে সাড়া ফেলেছে—যখন তাঁকে বলা হচ্ছে আধুনিকদের মধ্যেও তিনি আধুনিকতম, ঠিক তখনই নিজের হস্তলিপির অভিনব নান্দনিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে *শেষের কবিতা* উপন্যাসের নায়ক অমিত রায়ের তির্যক সংলাপের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করলেন তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপ—

> রবি ঠাকুর সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, তাঁর রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো—গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরণে। ওটা প্রিমিটিভ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মক্‌শো-করা।

অমিত রায় রবিঠাকুরের রচনা ও হাতের লেখার সমালোচনায় বিপরীতে রেখেছিলেন 'তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো,... বিদ্যুতের রেখার মতো... খোঁচাওয়ালা, কোণওয়ালা' প্রভৃতি ছাঁদের হস্তাক্ষরকে। যা রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার বৈশিষ্ট্য নয়। কবির লেখা হল 'মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে' 'ফুলের মতো'।

নিজের হস্তাক্ষরের সৌন্দর্য নিয়ে যে রবীন্দ্রনাথের এত গর্ব বয়সের ভারে শরীর জীর্ণ হওয়ায় সেই লেখনরূপের জৌলুসও কালের নিয়মে বিলুপ্ত হয়েছে। *গীতায়* আছে— 'শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি'। প্রমথ চৌধুরী দুঃখ করে লিখেছেন—

> ...গতকল্য তাঁর নিজহাতে লেখা দু'চার লাইনের চিঠি দেখে আমার চোখে জল এল। জরা যে মানুষের দেহের কি মারাত্মক শত্রু, তার প্রমাণ ঐ চিঠি। মুক্তো যে তেড়া-বাঁকা শামুক হয়ে উঠতে পারে, এর চেয়ে আপশোষের কথা আর কি আছে?—রবীন্দ্রনাথের মন এখনও সমান আছে, শুধু তাঁর আঙুল হয়েছে অবাধ্য।

কিন্তু বার্ধক্যজনিত কারণে রোগভোগে শরীর যদি অচল হয়ে যায়, মগজ সচল থাকলেও হাত অকেজো হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের শেষ ছোটোগল্প 'মুসলমানীর গল্প' কিংবা 'শেষ লেখা'-র অনেকগুলি কবিতা মুখে মুখে বলা অন্যের দ্বারা অনুলিখিত।

হাতের লেখার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জুড়ে থাকে নামসই বা স্বাক্ষর। স্বাক্ষর আসলে প্রতিটি লেখা-পড়া জানা মানুষের ব্যক্তি স্বরূপের বিশ্বাস নির্ভর আইনসিদ্ধ সামাজিক অভিজ্ঞান। সাধারণ শিক্ষিত মানুষ নাম সই করে দু'ভাবে। নাম ও পদবির পূর্ণ স্বাক্ষর (Full Signature) অথবা দু'য়ের আদ্যক্ষর কিংবা নামের আদ্যক্ষর ও সম্পূর্ণ পদবি দিয়ে সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর (Short Signature)। ছেলেবেলা থেকেই নিজের স্বাক্ষর মক্‌শো-করা একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। প্রথম জীবনে পঠিত গ্রন্থের পুস্তানিতে ও সে সময়কার পাণ্ডুলিপিতে তার প্রমাণ আছে। বিশেষ করে ইংরেজিতে নাম সইয়ের। পূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর ছাড়াও এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র স্বাক্ষরের সংখ্যা গোটা দশেক তো বটেই। এ ক্ষেত্রেও কবি নামসইকে কেবল ব্যক্তি মানুষের স্বীকৃত চিহ্ন বলে গণ্য করেননি; নিজের নামটিকে ঘিরে সৌন্দর্য সৃষ্টির তাগিদে লিপি শিল্পের নান্দনিকতায় উত্তীর্ণ করে দিতে চেয়েছেন। তাঁর স্বাক্ষরে আছে সমমাত্রা যোগে বর্ণসামঞ্জস্য ও 'কলমের ছন্দময় নিয়ন্ত্রিত গতি'।

দুই

বহুমাত্রিক স্রষ্টা জীবন এবং অননুকরণীয় ব্যক্তিজীবনে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ জোড়কলমটি ছিল তাঁর Fine Penmanship. লিপি-বিশারদেরা যাঁর সম্পর্কে বলবেন অসাধারণ ক্যালিগ্রাফার (calligrapher)। মনন ও সৃষ্টির শরীরী নির্মাণেও তিনি ছিলেন সৌন্দর্যের নন্দনকাননবাসী এক আধুনিক হস্তলিপি শিল্পের অধিকারী। লেখার বর্জিতঅংশকে

কালিমালাঞ্ছিত করে সেই পরিত্যক্ত বা মৃত লেখনাবলী থেকে এক চিত্রকলার বা ডুড্‌লিংস (doodlings)-এর জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একম অদ্বিতীয়ম্। কোনো মানুষের হাতের লেখার এমন কদর সমগ্র বিশ্বে দ্বিতীয়রহিত। এক সময়ে কবির এক টুকরো লেখন-লিপির চাহিদা এমন একটা মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সানুনয় ক্ষমা প্রার্থনা করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছিল তাঁকে। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ সই-শিকারীদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষার জন্য অর্থমূল্যের বেড়া তুলেছিল। এক একটি স্বাক্ষরের দাম ধার্য হয়েছিল এক টাকা। সেকালের পক্ষে বেশ চড়া মূল্য।

রবীন্দ্রনাথ আপন গ্রন্থের রূপ-সজ্জায় নিজের হস্তলিপিলাঞ্ছিত কাটাকুটির হিজিবিজি ছবি ব্যবহার শুরু করেন ১৯২৭ সালে *লেখন* কাব্যগ্রন্থ দিয়ে। এরও একটা ইতিহাস আছে। হাঙ্গেরির বালাতন-এ থাকার সময় ইউরোপের নতুন মুদ্রণ-প্রযুক্তিকে কাজে লাগাবার দায়িত্ব দিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে। যা কিছু নতুন তার প্রতি কবির আগ্রহ প্রথমাবধি। শুরু হল রবীন্দ্র-হস্তলিপির ফ্যাক্সিমেলি মুদ্রণ—আর সেটির সূচনা করলেন কবি নিজেই। চিঠিতে লিখলেন—

> জার্মানিতে গিয়ে দেখা গেল, এক উপায় বেরিয়েছে তাতে হাতের অক্ষর থেকেই ছাপানো চলে। বিশেষ কালি দিয়ে লিখতে হয় এল্যুমিনিয়মের পাতের উপরে, তার থেকে বিশেষ ছাপার যন্ত্রে ছাপিয়ে নিলেই কম্পোজিটরের শরণাপন্ন হবার দরকার হয় না।

লেখন-এর কবিতাকণাগুলি কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশ পায় বুডাপেস্ট ২৬ কার্তিক ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে।

কেবল গ্রন্থের সাজ-সজ্জায় নয়, ড্রইংরুমের দেওয়ালে ফ্রেম-বন্দি রবীন্দ্রহস্তলিপি আজ রাস্তা-ঘাটের হোর্ডিং-এও চলে এসেছে। নববর্ষের কার্ড থেকে শুরু করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-পত্রীতেও আকছার ব্যবহৃত হচ্ছে রবীন্দ্রহস্তলিপির নান্দনিকতা সম্বলিত কবির সৃষ্টি-সম্ভার। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই তাঁর সম্মতিক্রমে হস্তাক্ষর-সম্বলিত বিচিত্র ধরনের বিজ্ঞাপন ছাপা হতে শুরু করেছিল। তার মধ্যে কাগজ, কালি, কলম থেকে শুরু করে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, গ্রামাফোন কোম্পানি, পূর্বরেলের বিজ্ঞাপন, 'শ্রীঘৃত' এমনকি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার সম্পর্কে কবির অভিমত তাঁর হস্তাক্ষরে ছাপা হয়েছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। নজরুল ইসলাম সম্পাদিত *ধূমকেতু, জয়শ্রী, উত্তরা* প্রভৃতি সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রেরিত আশীর্বাণী তাঁর হস্তলিপিতে নিয়মিত ছাপা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে এই একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার নান্দনিক মূল্য বহির্মহল থেকে চলে এলো বাঙালির অন্দরমহলে। শাড়ি, জামা থেকে শুরু করে সৌন্দর্যপিপাসু রবীন্দ্রভক্ত গৃহসজ্জাতেও ব্যবহার শুরু করলেন রবীন্দ্রনাথের সুন্দর হাতের লেখাকে। জানলার পর্দা, বেড-কভার, কাপ-ডিসেও চলে এল রবীন্দ্র-হস্তাক্ষর। বাঙালি এইভাবেই রবীন্দ্রসাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রভৃতির মত রবীন্দ্রনাথের হস্ত-লিপিকেও দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে।

গত শতকে মেট্রোরেলের স্টেশনকে দৃষ্টিনন্দন করতে কবির হস্তলিপি আজ দেওয়াল চিত্রের মর্যাদায় ভূষিত। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার নান্দনিক ঐতিহ্য স্পর্শ করেছে আন্তর্জাতিকতার সীমাকে। ২০১৩ সালে কলকাতার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সৌন্দর্যসাধনে ব্যবহার হতে শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপি। ভারত সরকারের অসামরিক বিমান পরিবহন

মন্ত্রক নতুন টার্মিনালের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে যে বিজ্ঞাপন দেন তাতে তাঁরা ঘোষণা করেন— 'অভ্যন্তরীণ সজ্জা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্ট শিল্পকর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত।' অনেকেই হয়তো লক্ষ করেননি বা লক্ষ করলেও ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি অতবড় এয়ারপোর্টের সিলিং রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার শিল্পসৌন্দর্যে মণ্ডিত। এখানে রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপিকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে শিল্পী চমৎকার আর্ট ফর্ম তৈরি করেছেন।

ট্রেন চলে যায়, প্লেন আকাশে ওড়ে— পথ-চলতি ও আকাশবিহারী দেশি-বিদেশী মানুষ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রবীন্দ্র-হস্তলিপির প্রতিচিত্রের দিকে। রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা ভিন্ন মাত্রায় ধূসর পাণ্ডুলিপিকে প্রাণবান করে তোলার জাদুতে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোনো গ্রন্থ প্রকাশে তাঁর হস্তলিপিচিত্র দিনে দিনে অপরিহার্য হয়ে উঠছে। আধুনিক মুদ্রণলিপিকে পরাস্ত করে রবীন্দ্রনাথের লেখন প্রতিলিপি এক বড়ো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে।

বিশ শতকের শেষপাদে ২০০০ সালের ১৪ এপ্রিল একালের বিখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে। সুনীল একটি বহুল-প্রচারিত দৈনিক সংবাদপত্রে নিজের একটি লেখায় হাজার বছরের বাংলার পর্যালোচনা করতে গিয়ে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন—

> যুগ অতিক্রম করে সাহিত্যের একটা চিরকালীন বিচারও তো আছে। সেই বিচারে রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লেখক। এই শতাব্দীতে সারা পৃথিবীতেই বা তাঁর তুল্য আর কে আছে? কেউ কেউ একটা-দুটো ম্যাজিক বেশি ভালো জানেন, কিন্তু এই মানুষটি যে ম্যাজিকের ভাণ্ডারী।

রবীন্দ্রনাথের বহুমাত্রিক প্রতিভার অন্যতম একটা 'ম্যাজিক' হল তাঁর অনন্যতুল্য হস্তাক্ষরের শিল্প-সুষমা।

Art Exhibition at Rajendralala Mitra Bhavan

Dr. Satyabrata Chakrabarti, General Secretary of The Asiatic Society delivering the Welcome Address at the art exhibition on "A few visionaries of the world – Thread on Canvas" organised in collaboration with Rekha-Chitram held at the Rajendralala Mitra Bhavan (Salt Lake Campus of the Society) during 22-28 February, 2023.

President's Column

Civil Society, State and Democracy

In view of the increasing concentration of power in the hands of the modern state, the discourse on civil society and the relevance of the concept has become a matter of increasing interest. After the Second World War and during the second half of the 20th century, the rise of several post colonial states and the mode of their functioning attracted widespread attention. There were two models for them to emulate. There was the competing political ideologies of modernization, viz, Capitalism and free market economy, Socialism as in then USSR, Fascism as in the erstwhile Germany or democratic or Fabian Socialism or latter day, Euro-communism. The democratic mode of governance was opted by most of the new born states. However, ruling classes in most of these states found the democratic model to be too slow to meet the rising expectations of people. As a result in most of these states, the institutional framework of democracy collapsed and dictatorships in various nomenclatures were established. Civil liberties of the people were trampled. The end of colonialism failed to meet the democratic aspirations of people. Even in some of the states, democracy which was in existence was there only in form, not in substance. In such a context, the discourse on civil society and its contemporary relevance has its roots in the nation building experiences of these states. As one author has dramatically put it, it is a continuing dialogue between old societies and new states.

The Classical Debate

The discourse can be traced back to the writings of the Contract theorists like Hobbes, Locke and Rousseau and to the writings of Hegel, Marx, Engels or Gramsci. Many other subsequent writers have joined the debates and formulated their opinions. The basic problem is to identify the domain of the state and the domain of the society, to postulate a theoretical distinction between the two and to delineate the mode of interaction between them.

Hegel's view of the state was that the state is the ultimate embodiment of reason. He spoke in terms of the rationalization of the state and of the statization of reason. The state is not only responsible for the creation of civil society but also for its sustainance. To Hegel, the creation of civil society is the achievement of the modern state that unifies the duality of civil life and political life. He argues that civil society has to capture the spirit of modern capitalism that serves individual interest, but also as it embodies the public sphere of ideas, it must have a commitment to certain collective interests.

On the other hand, to Marx, the state,

instead of being a rational agency represents a 'concentrated and organized force of society'. In the present capitalist society, the domain of civil society is captured by the state. The contradictions which are there in the realm of civil society are captured by the dominant class and are subsumed within the state and the state becomes an agency of coercion in the hands of the ruling class. As Marx has put it, 'Civil society as such only develops with the bourgeoisie's social organization evolving directly out of production and commerce which in all stages forms the basis of the state and of the rest of the idealistic super structure which has, however, always been designated by the same name'. So, whereas for Hegel, the state is an armature of civil society and is situated higher than the civil society, to Marx, on the other hand, Statism, Centralism and Bureaucratism are instruments in the hands of the state to institutionalize social and political alienation which would be antithetical to civil society.

Gramsci's concept of civil society differs from that of Hegel on the one hand and from Marx and Engels on the other. Whereas to Marx, the anatomy of the civil society institutions is to be sought on the political economy, to Gramsci, the civil society belongs to the super structural sphere. As he says, 'it comprises not all material relationships but all ideological cultural relations; not the whole of commercial and industrial life, but the whole spiritual and intellectual life'. He argues about the relative autonomy of these ideological elements. He talks about hegemony- but this hegemony is not a special organization of force as Marx says but the class interest of the ruling class which is transcended by a moral and intellectual leadership and thus maintains a desired civil society-state equilibrium. The economic substructure does not rigidly condition the realm of values, ideas, education etc which are parts of the super structure and which constitute the civil society.

Anatomy of the Concept

As distinguished from the Hegelian -Marxist – Gramscian vocabulary, the notion of civil society today stands for 'a set of institutions that stand for liberalism in the form of free market in economic sphere and democracy in the political sphere. Interpreted in this sense, liberalism and civility are the core elements of civil society as conceptualized today. Edward Shils, one of the champions of civil society concept, says, the notion of civility considers others 'as fellow citizens of equal dignity in their rights and obligations treating others, including one's adversaries or detractors as members of the same collectivity, even though they belong to different political persuasions, religious or ethnic communities whose interest runs counter to those of yours'. What is then implied in civil society is the individual's freedom in daily life, in which, his or her choices are honoured. It means that powerful groups with tyrannical ideas are not allowed to erode the space meant for individual's moral autonomy. It upholds voluntarism and freedom and offers individuals, irrespective of their creed, colour or culture, an equal chance to create their own selves. It's an open sphere which not only permits differences but also tolerates dissent, and to a certain extent even encourages it.

But, if we analyze the above concept further, there is some incongruence between freedom in the economic sphere and the notion of civility as interpreted in the above sense. It can be argued that although, normally the development of capitalism and modernity should coincide, it may not always happen that way. Hence, the basic ingredients of civility may as well be missing in capitalist economies. Although capitalism, while fostering free and competitive market, fosters legitimization of the principles of economic freedom, political liberty and institutionalization of socio-cultural pluralism, it may not always be so. Even Adam Smith, the

proponent of a free economy, apprehended that forms of syndicalism among producers and distributors of commodities or services can and do violate the principles as well as the practices of free market and harm the collective interest in protecting individual's liberty of choice. This type of syndicalism may not be confined within a national boundary but worldwide chain of multinational corporations may prove detrimental to civilizational identity for some at the expense of others. Enough examples of this situation can be given from the contemporary global scenario.

Gellner, another authority on the concept of civil society, characterizes civil society as a total society, that is, 'a set of social relations which articulates relationship between allocation of power and domination of the production and distribution of material resources'. He further says, the holistic character of civil society lies in its individualism, is related to the process of secularization and it treats all cultures as equal. Its passionate commitment to critical reason makes it accept rule of law as an act of faith. Hence, social bonds in civil society, unlike in hierarchical agrarian societies, are both individualistic and egalitarian at the same time. Interpreted in this sense, democracy and civil society go hand in hand and they reinforce each other. So both civil society and democracy are preconditions of the existence of each other. Historically they have reinforced positive strengths of each other. And it has been argued that industrial society is conducive to the growth of the values of civil society. At least, this is theoretically so. If there are exceptions, the civil society theorists call them as aberrations.

Contextualizing the Issue in India

Politically speaking, the record of Indian democracy has not been totally unimpressive. Elections have been held regularly; voter turnout in elections, which is massive, is a pointer of the people's robust faith in participatory democratic governance. The ruling parties resort to politics of cooptation which signals, according to Rajni Kothari, 'a form of government that promotes and protects rights in a socio culturally plural society and that shelters competing, often conflicting, interests.' Not only that India witnesses a smooth transition from colonial rule to popular government, her democratic institutions have demonstrated tremendous resilience and independence.

But this formal maintaining of the democratic façade does not indicate that everything is going on well in India. This becomes particularly evident when we analyze the nature of civil society which has been created. On analysis, it will become apparent that a large part of civil society in India consists of very fluid social groupings which are founded on primordial identities of caste, ethnicity, religion and kinship bonds. These bonds, as it has been stated, are unworthy candidates for voluntary social groupings which constitute the prime component of civil society. Chandoke, when analyzing the nature of civil society in India, shows that particularistic loyalties have been eroding the sphere of individual freedom. She is critical of the way how attempts are being made to rake up fundamentalist ideologies now and how such an ideology would eliminate any scope for contestations and dialogues. According to her, religious fundamentalism constitutes the greatest challenge to civil society.

Andre Beteille, while commenting on the institution of civil society in India, has distinguished between institutions of civil society (such as banks, universities, hospitals, schools, press etc.) and other types of mediating institutions in society. The former embody modern concern of individual liberty and function more as open and secular forces which are conducive to civil society. Such institutions protect individual autonomy and freedom in a non discriminatory manner and are controlled neither by the state nor by

religion. Commenting on civil society and the functioning of its institutions in India, Betellie has argued that institutions of civil society have been rather conspicuous by its absence or, if at all they have emerged, they have been over shadowed by the personalities of their creators.

In heterogeneous and hierarchical societies such as India, organized groups and communities should be recognized as legitimate inhabitants of civil society. Chandoke observes, 'civil society in India is seen by most theorists as a fluid association of social grouping which are based on caste or kinship linkages or on religious mobilization as much as on voluntary social associations'. What we find today is tension between different dimensions of civil society. The interrogation of the majority by the minority groups, of the dominant by the dominated and vice versa, should also be recognized as normal activities within the civil society. But what we find instead is majoritarianism, growing intolerance towards other groups and an attempt towards forceful resolution of differences. Institutions of civil society and political democracy must reinforce each other and must be engaged in a continuous dialogue with each other. This is what is largely missing in the Indian situation. Particularistic ideologies have been eroding the sphere of individual freedom which must remain unassailable in any society to qualify to call a civil society.

In a succinct analysis of the negative factors endangering the growth of civil society in India, D. N. Dhanagare has identified them in the following way:

1) The declining legitimacy of the state which has been more frequently challenged by insurgencies and secessionist movements, on the one hand, and fundamentalism and terrorism of all sorts, on the other;
2) The debacle of institutions, whether parliament or political parties, economic-industrial, banking or trade, education, sports or cooperatives;
3) Growing intolerance despite ethnic or cultural plurality, especially intolerance towards minorities;
4) Lack of communication, discussion and debates on public issues among sections with diverse backgrounds and political-ideological persuasions and;
5) Weakening capacity for conflict resolution at all levels.

However, it is not our contention that civil society does not exist in India. Time and again, the Indian electorate have proved that they can respond effectively to the macro political issues and have intervened effectively to change the government. But forces to the contrary are also active. Our point of view is that civil society formation is a process and that process is still active.

Swapan Kumar Pramanick
President

An Overview of Dr. B. R. Ambedkar's Ideas of Education and its Relevance in the Present Indian Situation

Bankim Chandra Mandal
Professor, Department of Political Science, Rabindra Bharati University

Introduction

Dr. Ambedkar expressed his educational thought through his speeches, debates, newspapers, essays, interviews, literary works, and movements. His thoughts during his lifetime were responsible for changing the lives of the masses, especially the lives of the Dalits. Babasaheb, in his educational thought, was very much influenced by Gautama Buddha, Mahatma Phule, and other social revolutionaries and eminent educationists. Mahatma Phule and Savitribai Phule's zeal to educate the Dalits and non-Dalits greatly inspired him. Ambedkar was also influenced by John Dewey's ideas on the scientific method of experimental approach, democracy, and pragmatism in the arena of education. He adopted a very pragmatic approach to solving the problem of educational advancement of the common masses in general and Dalits in particular. He believed that education is one of the basic needs along with food, clothing, shelter, and health. So, he had taken a serious initiative to guarantee educational rights without discrimination to all the citizens of independent India. He wanted to use education as an important tool to establish a society based on liberty, equality, fraternity, and social justice. He was also interested to replace the birth-based society with a value-based one. He said that these moral values can be promoted through education (Meena, 2017). According to him, education makes man enlightened, makes him aware of self-respect, and also helps him to lead a better life materially (Salagare, 2018). The basic objective of his philosophy of education was to inculcate the values of liberty, equality, fraternity, justice, and moral character among students of all religions, regions, classes, and castes. His contribution to the advancement of education in the country is multifarious.

Artist : Isha Mahammad

Ambedkar's views on education

Dr. Ambedkar had never recognized the Hindu knowledge system as secular because this system ruined intellect, was responsible

for all evils, and could never create a mature civilization. In the words of Ambedkar, "There are countries where education did not spread beyond a few. But India is the only country where the intellectual class, namely, the Brahmans not only made education their monopoly but declared the acquisition of education by the lower classes, a crime punishable by cutting off the tongue or by pouring molten lead in the ear of the offender"(Moon, 2014, p. 215). He was also against the Indian traditional educational system. In this context, he rejected Dr. Radhakrishnan's views on the traditional education system. Actually, Dr. Radhakrishnan was in favour of the preservation of the Indian traditional educational system. Criticizing Radhakrishnan's views, Ambedkar stated that the main cause of the degradation of the Dalits was that they were denied the right to education from time immemorial by the upper caste Hindus. He also believed that the upper castes were responsible for the denial of the right to education which was the main cause of their dismal socio-economic conditions and degradation. Opposing the traditional education system he argued in his journal 'Janata' on November 20, 1954, that three - fourth population was no longer able to develop because education was in the hands of Brahmans. Ninety percent population in this country was illiterate. So it was very difficult to educate them through the traditional education system that was praised by Radhakrishnan (Rajhans, 1995, p. 633). He believed that the old education system will not reach the lower castes because it nurtured and cultivated a caste system.

Ambedkar considered education as a tool to bring desired changes in society and a prerequisite to launching any organized social movement in the present context (Chengte, 2016,p. 634). He was of the view that through education the process of change begins in the social, political, economic, and cultural life of the individual. He considered education as a power that it shapes and forms a new society and new consciousness. Moreover, through education, one becomes conscious of individuality, truth, and freedom. He said, "If the necessity of individual liberty is accepted, it is necessary that each person should be able to protect his freedom and such power i. e. to protect his freedom can never be had without education"(As cited in Rajhans,1995,p. 44). According to him, education is not merely a means of livelihood but a sharp weapon to liberate the Dalits from ignorance and strengthen their fight against injustice, exploitation, oppression, and humiliation. Ambedkar also observed, "The backward classes have come to realize that after all education is the greatest material benefit for which they can fight. We may forego material benefits, we may forego material benefits of civilization, but we can not forego our rights and opportunity to reap the benefits of the highest education to the fullest extent" (Narake, 2005, p. 62). In fact, Ambedkar emerged as a champion of the education and education movement for the creation of consciousness and liberation of the Dalits.

Ambedkar firmly believed that education plays a decisive role in the social emancipation of Dalits. Keeping in mind the crucial role of education, he raised an epoch-making slogan in addressing to All India Depressed Classes Conference in 1942. He stated, "My final words of advice to you educate, agitate and organize, have faith in yourselves and never lose hope" (Narake et al 2003, p. 276). We saw 'educate' as the first word of his message. He believed education plays a significant role in building human character and consciousness. By education, Ambedkar did not mean merely certificates and degrees. For him, to educate means to become aware of one's real-life condition, be conscious of one's surroundings, object to the inhuman existence in society, and ask for change for the better. It is such an education that will stir agitation within, leading to what

Ambedkar called 'agitate'. The word 'agitate' does not mean to agitate physically but mentally. According to him, an agitated mind would force educated people to form an organization for a common mission which will help them to unite and struggle for their common goal.

Ambedkar thought that education is an instrument to change destiny. In his own words, "I am inclined to blame the parents and not the sons miserable that they are now. We must not entirely give up the idea that parents give 'janma' to the child and not 'karma'. They can mould the destiny of their child by giving them education" (Khirmode, 1974, p. 68, Rajhans, 1995, p. 124). The above-mentioned statement suggests that giving karma is superior to giving birth to progenies. According to him, giving karma means imbibing good conduct that is possible through education. He was of the view that for educating the masses due importance has to be given to moral values and character building. Without such values educated person has no utility in society. Addressing the Youth Conference on February 12, 1938, he stated that "Education was a sword and is a double-edged weapon, was dangerous to wield. An educated man without character and humility is more dangerous than a beast. If his education is detrimental to the welfare of the poor, the educated man was a curse to society. Fire upon such an educated man!" (Narke et al. 2003, p. 193). Ambedkar considered character is more important than education (Narake et al. 2003, p. 193). So moral values and character is of immense value regarding education.

Gender Equality in Education

He said in a very convincing way that "We shall see better days soon and our progress will be accelerated if male education is persuaded side by side with female education" (As cited in Rajhans, 1995,124). He is convinced that the progress of any community depends on the education of both males and females. Delivering a lecture on July 20, 1942, at Nagpur, he stated "I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved" (Narake, 2003, p. 282). He further said, "Let your mission, therefore, be to educate and preach the idea of education to those at least who are near to and in close contact with you" (Khirmode, 1974, p. 69, Rajhans, 1995, 125). Being a champion of women's rights, Ambedkar was a strong supporter of women's education. He had no belief in the preconceived notion of women's intellectual inferiority. For ensuring self–reliance on the future generation he proposed to incorporate democratic values and provide equal opportunities to boys and girls. He gave due importance to gender equality and the need for education. Ambedkar observed, "In the absence of education man is a mere animal, a beast. Starvation of the body results in weakening it, similarly in the absence of education he remains idiotic, becomes slave" (As cited in Rajhans, 1995, p. 43). He is convinced that women can play a significant role in the personality development of the child. That is why he recommended that for the advancement of women, maximum lady teachers should be appointed in schools.

Ambedkar believed that education is essential for all men and women irrespective of their social and economic position. However, large sections of Dalit people were historically deprived and discriminated against regarding education. So, vast illiteracy was prevailing among the general masses including the Dalit community. So, to stamp out illiteracy Babasaheb asserted the necessity of free and compulsory elementary education. He thought that primary education is the minimum essential need for educating the masses. He said, "The object of the primary education is to see that every child that enters the portals of a primary school does leave it only at a stage when he/she becomes literate and continues to be literate throughout the rest of his/her life" (Narake, 2005, p.

45). Babasaheb asserted that compulsory education is essential to those who do not understand the value of education and who are indifferent to it (Rajhans, 1995, p. 653). In his opinion, primary education was the foundation of national progress.

Primary Education

He opined that the issue of compulsory primary education is not to be handled intermittently but with a uniform policy. Despite emphasizing free education, he believed that education should not be free to all though it was made compulsory. The fees should be collected from those who can pay and free to those who are not able to pay (Rajhans,1995, p. 654). He was also in favour of the expenditure of more public funds on primary education. He firmly said that primary education should be given through the mother language, "otherwise it would be valueless and meaningless" (as cited in Rajhans,1995, p. 207). He further added, "unless compulsion in the matter of primary education is made obligatory and unless the admission to primary schools is strictly enforced, a condition essential for the educational advancement of backward classes will not come out into existence" (Sanyal,1996b, p. 145).

Higher Education

Ambedkar's vision of education was not only confined to school education but also higher education. He emphasized higher education because he thought, a person equipped with higher education can bring about social change. Moreover, he is convinced that as long as higher education is not imparted to the masses or Dalits, the power will be in the hands of the advanced sections of society. He was of the view that the spread of higher education among the masses is needed because the upper castes had never done well for the welfare of the masses. When the power was in the hands of the upper castes, they did nothing except exploit the masses (Rajhans,1995, p. 656). He was convinced that the social milieu is one of the factors that expedite the process of development. If teachers and society members fail to provide a healthy social milieu to the Dalits, they will not be able to have higher education (Rajhans,1995, p. 657). Keeping in view the importance of higher education, he stated, "The gulf between the education of Brahmans and non-Brahmans will not end just by primary education and secondary education. The difference in status between these can only be reduced by higher education. Some non-Brahmans must get highly educated and occupy the strategically important places which have remained the monopoly of Brahmans for a long"(Sowbhagya, 2014, p. 179). So he advised the Dalit communities to attain higher education as an instrument of empowerment and furthering intellectual advancement and exposure (Agarwal, 2021, p. 136). According to him, the advancement of education would mean that high administrative posts hitherto out of reach for the Dalit community would now be available. He believed that entrance into government services will bring about progress in their life. In this regard, he suggested paying special attention to higher education. He thought it is better to have one graduate than have a thousand students who have passed their fourth standard (Khirmode, 1990, p. 24). According to him, all those communities that are educationally backward must have to provide entry into every stage of higher education so that they could realize their rights and responsibilities (Narake,2005, p. 52). He was of the view that the government has to provide affirmative measures for ensuring poor needy people and service to them. The state has to perform this task. He thought that without government aid, the Dalit community will never be able to gain access to advanced education in science and technology and it will not be just and proper if the Government of India comes forward

to extend help to them in this regard. The main reason was that India is composed of different communities that are very unequal in their status and progress. So, it is necessary to provide affirmative measures to the weaker sections so that they come to an equal level (Narake, 2005, p. 42).

University Education

Ambedkar was in favour of the creation of a knowledge society. According to him, the basic function of a University is not merely dealing with the problems of examinations and granting degrees but also "to provide facilities for bringing the highest education to the doors of the needy and the poor"(Narake, 2005, p. 61). According to him, "The aim and functions of University education should be to see that teaching carried on there suited to adults; that it is scientific, detached, and impartial in character; that it aims not so much at filling the mind of the students with facts or theories as at calling forth his own individuality; stimulating him to the critical study of the leading authorities, with perhaps, the occasional reference to the first-hand sources of information, and that it implants in his mind a standard of thoroughness, and gives him a sense of difficulty as well as the value of reaching truth"(Narake, 2014, p. 290).

Ambedkar firmly believed that a University is a place of advancement of higher education and authentic research. If University would work only as an examining body, it could not achieve its objective of promoting authentic knowledge and good research. For promoting research and advancement of higher learning he opposed any sharp division between post-graduate and undergraduate teaching. In this regard, he argued that "The separation of post-graduate work from undergraduate means the separation of teaching from research. But it is obvious that where research is divorced from teaching research must suffer" (Narake, 2005, p. 298). In this regard, he stated that to make a synthesis in which the university and the colleges would be a partner on terms of equality and would be participating in promoting together, both the undergraduate and postgraduate studies (Narake, 2005,p. 48). He was of the view that "--- no research, no promotion of knowledge, can be carried on with any benefit either to the colleges or to the university, or to the public at large" (Narake,2005, p. 46)

Ambedkar had a very strong affirmative view on the use of the vernacular instruction. He believed that the "Spread of education should be a proper function of the University. But this can not be achieved unless the University adopts vernacular as a medium of instruction" (Narake, 2005, p. 312).

Autonomy of the Higher Educational Institutions

Ambedkar stated that the University is concerned with the intelligentsia and the educated class. For the proper functioning of the University, it must be controlled by the educated class (Narake, 2005, p. 61). He was in favour of the autonomy of the Universities in admissions, teaching, examinations, and appointment of faculty members and others. He believed that all the academic issues of a University should be determined by the teaching community of the University. The government should have no control over a university education. In his own words, "Government should have no control over the academic affairs of the University which must be entirely entrusted to the facilities. But the government should have some control over the legislative and administrative affairs of the University"(Narake, 2005, p. 312). The way of government control should have by means of nominations to the educational administrative bodies like the Senate or Court of the University. In other words, he was against any external agency's role regarding administrative as well as any academic affairs of the University. He clearly expressed the role of the Vice-Chancellor, Senate, Syndicate,

Faculty Council, Dean, etc. in the teaching and administrative affairs of the University.

Curricula and its framing

In the curriculum, Ambedkar had a practical approach. He was convinced that utility should be the basis of framing curricula and he was in favour of flexible curricula. He thought that "Nothing is immortal. Nothing is binding for an indefinite period of time, everything needs to be tested and examined, nothing is final, everything is bound by the cause-effect relationship, nothing is everlasting; everything is changeable. Things are happening continuously." Ambedkar firmly believed that no external agency but the faculties concerned should design curricula. He also believed in democratic curricula, which should be put together by teachers concerned in keeping with the demands of the subject and the students. He was also in favour of such curricula which will be helpful for students to get jobs and would make them capable (Meena, 2017). For ensuring these objectives he also wanted an extensive technical and advanced scientific education. The faculties concerned should have absolute authority in framing and designing curricula.

Views on Teacher

In Ambedkar's ideas of education, the teachers had an important role in the process of learning and imbibing. The main function of a teacher is to understand the mental abilities of the students and develop them and guide them. In his own words, " A good teacher is the friend, philosopher, and guide of his students." A good teacher is also knowledgeable about the reality of society. According to him, a teacher especially in higher educational institutes should be research-oriented. In his opinion, a person who is not self–centred and selfish but has constructive ideas and devotion should be appointed to the educational institutions.

Formation of different Platforms to Disseminate Education among the Masses

Ambedkar opined that education is an important instrument to reach doors of light and perception to remove the arena of darkness and ignorance. According to him, "Education is something which ought to be brought within the reach of everyone. . . . Education ought to be cheapened in all possible ways and to the greatest possible extent" (Narake,2005, pp. 40-41). He firmly believed that education should never be commercialized. It should be affordable and accessible to the masses. During his contemporary time, the socio-economic position of Dalits was in a very dismal condition. The Hindu orthodoxy created a myth that the Dalits are incapable of learning. That is why the Dalit community has been excluded from the whole process of learning. So, vast inequalities have existed within the education system in India. Due to their dismal socio-economic conditions, they could never think of sending their children to educational institutions. So, Ambedkar not only proposed the ideas but also practiced them. In fact, to remove hurdles and promote education among Dalits, he established the People's Education Society in 1945. The main objective of this institution was to set up educational institutions and to provide help to such institutions. It was established "in tune with his conviction regarding the role that education could play in the social and economic" advancement of the Dalit community (Nambissan, 2001, p. 84). During his lifetime he established many schools, night schools, colleges, hostels, libraries, training centres, etc. for the Dalits at different places in the Bombay Presidency. Ambedkar expressed his intentions and importance behind establishing institutions like Siddharth College under the People's Education Society which was very egalitarian in nature. According to him, "The college is

not a sectarian institution. It will be open to students from all communities and of all creeds from all provinces and states. The future of the college will be the particular care of the students from the Scheduled Castes, who will be granted facilities in the matter of admission, free-ships, scholarships, and hostel accommodation. The governing body of the Society desires to make college a model institution for imparting higher education" (Narake et. al. 2003a, pp. 442-443).

Ambedkar was fully convinced that to educate the excluded Dalits and awaken their consciousness against the discriminative and oppressive structures, the creation of platforms is needed. It was intended for socio-economic endosmosis and resulted in the substantive social and economic development of the society (Sangole, 2022, p. 203). He used his newspapers like Bahiskrit Bharat, Mooknayak, and Janata to disseminate the idea of education among the Dalits and delivered several speeches to awaken the Dalit students, youth, women, and other marginal sections of Indian society. He also incorporated many provisions in the Constitution to ensure educational safeguards for Dalits and Adivasis, the most deprived sections in our society.

Relevance of Dr. Ambedkar's Educational Ideas in present India

Babasaheb Ambedkar had given a practical and pragmatic vision of education. He had developed a profound faith in the effective instrumental and transformative role of education. He considered education as a means to reach the doors of light and perception to remove the arena of darkness and ignorance. He believed that for establishing a healthy democratic society Dalits, Adivasis and other marginal sections should be educated properly. He emerged as a champion of education for the masses and an educational movement for the creation of consciousness and liberation of the marginal sections. He profoundly wished to ensure equality, freedom, and justice for the vast downtrodden people from the most dehumanized and wretched conditions through the modern method of education. He firmly believed that in this process of transformation and educational modernization of the Indian masses support of State is needed enormously. In fact, his views and thoughts on education have been incorporated directly or indirectly into the educational system of post-independence India. But due to poor infrastructure, low standard of public education, the unhealthy situation in government schools, a high number of students dropping out, a shortage of teachers, and poor research facilities India could not reach the expected level of educational development. Moreover, under a neo-liberal market economy, the state is withdrawing its responsibilities from the social sectors of education, employment, health etc. in a massive way. On the other hand, the role of private players in the education sector has increased enormously in the last two and half decades. Today privatization and commercialization of education are not mere rhetoric, but it is now a big reality. In this process of commercialization of education, poorer sections of society are the worst sufferers.

In the present situation, we saw that the educational views and thoughts of Ambedkar have been seriously challenged in the New Education Policy 2020. His contribution to the universalization of education, free and compulsory primary education, publicly funded education, free from government control education, teacher's role in curriculum framing, secular and scientific education, the autonomy of higher educational institutions, opposition to the commercialization of education, affirmative measures in education and the idea of inclusive education are now under big challenge. The main content of the NEP is excessive political control over education, privatization, and commercialization of education, communalisation of education,

and social exclusion. The other aspects of the NEP are to promote an undemocratic system of governance and to curb the autonomy of higher educational institutions. It is a well-known fact that if the privatization and commercialization of education are to be increased, education become more expensive and inaccessible to the vast majority of the poorer sections of society. Not only has that more and more commercialization of education led to more and more social exclusion which is inevitable. If the NEP is continued, his vision of a just society that is based on liberty, equality, fraternity, and justice will never succeed in the future. So under the present situation, a strong mass movement is needed so that the government is forced to withdraw such regressive anti-people policy.

After the introduction of the neo-liberal economy, we are witnessing different types of problems and crises in the educational sector in India. A large section of stakeholders from K. G. to P. G. and academicians are protesting and demonstrating against the emerging problems in the educational sector and demanding a reasonable solution, where Ambedkar's educational thought can show us the right direction. For universal and inclusive education of the Indian masses, Dr. Ambedkar's views are still relevant and effective in the prevailing vast illiteracy and poverty-driven Indian state. Considering the Indian situation, we may say that his idea of public-funded free and compulsory education, secular and scientific education, the autonomy of higher educational institutions, opposition to the commercialization of education, affirmative measures for educating the needy weaker sections etc. are still very pertinent and effective.

References

Agarwal, Shivam, (2021). Education and Its influence on the nation-building process: A reflection on Ambedkar's views in colonial India. *Contemporary Voice of Dalits*. 13(2). pp. 132- 140.

Chengte, Dr. Prahlad. (2016). Dr. Ambedkar's empowerment on educational thought: Some review. *Indian Journal of Applied Research*. 6(1), pp. 633 -635.

Khirmode, C. B. (1990). *Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar*. Sugua Prokashan. Vol. III.

Moon, V. (Ed.) (2014). *Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and speeches*. Vol. 9, Ambedkar Foundation

Nambissan, Geeta B. (2001). Equality in education? The schooling of dalit children in India. In Shah, Ghanshyam (Ed.). *Dalits and the State*. pp. 79 – 128). Concept Publishing Company.

Narake, Hari. (Ed.). (2005). *Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and speeches*. Vol. 2, Source Material Publication Committee, Higher and Technical Education Department, Government of Maharashtra.

Narake, Hari. et. al. (Ed.). (2003a). *Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and speeches*. Vol. 17(2). Dr. Babasaheb Ambedkar Source Material Publication Committee, Higher Education,Department, Government of Maharashtra.

Narake, Hari. et. al. (Ed.). (2003b). *Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and speeches*. Vol. 17(3). Dr. BabasahebAmbedkar Source Material Publication Committee, Higher Education Department, Government of Maharashtra.

Rajhans, Shamshankar Sadashib. (1995). "A study of educational thoughts and work of Dr. B. R. Ambedkar" (An unpublished Thesis, Shivaji University). Retrieved from https:// shodhganga. inflibnet. ac. in

Salagare, Dr. M. B. (2018). "Dr. B. R. Ambedkar's views on education." Retrieved from https://www. researchgate. net/publication/322695770

Sangole, Mrinal. (2022). "Understanding Dr. B. R. Ambedkar's idea of social democracy and higher education through Siddharth College, Bombay." *Journal of Social Exclusion Studies*. 7(2),

Sanyal, Professor Ashis. (1996). *Babasaheb Dr. Ambedkar rachana sambhar* Bangla Sanskaron. Vol. 4. Dr. Ambedkar Foundation Welfare Ministry, Government of India.

Sowbhagya, G. (2014). "Dr. B. R. Ambedkar's philosophy on higher education and it's relevance to the present society." *International Educational E- Journal*. III(II).

Welcome Address

Satyabrata Chakrabarti
General Secretary, The Asiatic Society

Good morning to the participants and viewers of Poland and good afternoon to the participants of India :

Friends, on behalf of The Asiatic Society, Kolkata, I extend a very hearty welcome to all of you in this international webinar. I welcome His Excellency, Professor Adam Burakowski, the Ambassador of the Republic of Poland to India, for very kindly agreeing to be present in this important discourse as the Chief Guest. In fact, today's event is otherwise the outcome of His Excellency's visit to The Asiatic Society, Kolkata, on 13th August, 2021, where he had mooted the idea of some academic exchange through the participation of scholars of both the countries in a common platform. Today, we have met in one such programme as the modest beginning despite the prolonged continuation of a global pandemic situation—COVID-19—for the last two years.

At present, we have collaborated with the International Cultural Centre, Krakow, Poland, with the assistance of Honourable Consulate of Poland in Kolkata, specially Sri Joydeep Roy, the Chief Consular Officer, and have decided to initiate a dialogue on a very important subject, namely, 'Cultural Significance of Studies on the Ancient Cities in Poland and India : Emerging Perspectives'. Briefly speaking, the characteristics of cities have been studied from various points of views of socio-cultural and biological evolution of man and his space of living. While the demographic composition, density of population, economic diversification, elaborate growth in civil and political administration etc. have transformed the human and physical space from a pristine rural to an emergent urban milieu, a city has also been distinguished on account of its wider multiple network, complex human interactions, consolidation of numerous power centres, and in specific cases, due to being a great religious and pilgrim centre, a seat of learning of ancient and classical human knowledge by specialists, a growth centre of intellectual proliferation and urban literatii centre of focal transaction in art and architecture, spiritual as well as material culture, trade and commerce, industrial enterprise, higher cultivation of science and technology and so on an so forth.

I take this opportunity of welcoming the four distinguished speakers in today's panel, two each from Poland and India. Mr. Łukasz Galusek, Programme Director, International Cultural Centre, Krakow, will talk on the city I – Katowice, Poland; Dr Michal Wisniewski, Head, Educational Deptartment, Academy of Heritage, ICC Krakow, will talk on city II – Krakow, Poland. On Indian side, Professor Mohan Gupta, Former Vice-Chancellor, Maharshi Panini Sanskrit & Vedic University and Chairman, Ujjayini, Vidvat Parishad, will talk on city III – Ujjain, and Professor Binda Paranjape, Professor of History, Banaras Hindu University and former Fulbright-Nehru Visiting Faculty at George Mason University, USA, will talk on city IV– Varanasi. Each one of them has earned eminence in their respective areas of academic and professional specializations.

Once again, warm welcome to you all to this maiden venture between The Asiatic Society, Kolkata and the International Cultural Centre, Krakow, Poland.

Thank you very much.

Out of the four articles, two, viz., i) "Krakow Cultural Heritage" by Michal Wisniewski & ii) "Ujjain: The Grand City Eternal" by Mohan Gupta have been published in the *Monthly Bulletin*, Vol. LII, No.3, 2023 (pp. 17-32) and the rest two, viz., iii) "Katowice and Upper Silesia: The Modern Adventure" by Łukasz Galusek & iv) "Emerging Perspectives in the Study of Cultural Significance of the Ancient Cities: A Brief Note on Varanasi" by Binda Paranjape are published in this issue (pp. 24-35).

Inaugural Address

Adam Burakowski
Ambassador of the Republic of Poland to India

Ladies and gentlemen—good afternoon :

I am very happy to be present at this Webinar today, which aims to bring the cities of Poland and India closer and more importantly help in building bridges of cooperation between the two countries. I would like to thank The Asiatic Society, Kolkata, International Cultural Centre, Krakow and especially, Mr. Joydeep Roy, Chief Consular Officer of the Honorary Consulate of Poland in Kolkata for conceptualising and facilitating this Webinar.

I had the pleasure of meeting the Council Members & Officials—including Dr. S.B. Chakrabarti, General Secretary of The Asiatic Society during my visit to Kolkata in August 2021. While the idea of undertaking collaborative projects between Poland and India was established during that visit, I am really pleased to see that this Webinar has been organised within a few months since then. While this programme is just the beginning, I hope that many more joint initiatives will be undertaken by Polish Institutions like ICC Krakow and The Asiatic Society in the future.

It is heartening to see that Dr. Łukasz Galusek, Programme Director of ICC Krakow is going to present about the evolving city of Katowice, while Dr. Michal Wiśniewski, Head, Academy of Heritage, ICC, Krakow gives a presentation on the ancient city of Katowice. Both these cities have unique characteristics, which is surely going to enthral the participants of this Webinar. On the other hand, it will be wonderful for those joining in from Poland to learn more about the fascinating cities of Ujjain and Varanasi from the experts who were present here.

I do not wish to take up much of your time, but thank the organisers once again for giving me an opportunity to share my thoughts about this interesting Webinar taking place today. As mentioned earlier, let this be the beginning of many other interesting programmes—that we must endeavour to organise in the days to come.

Thank you !

Katowice and Upper Silesia : The Modern Adventure

Łukasz Galusek
Programme Director of ICC, Krakow

Although Upper Silesia is not an island that emerged from the ocean two hundred years ago, all things important to the region have occurred there during the last two centuries. This coincides with the time when the civilisational, cultural, and artistic foundations of modern Europe were formed. As we can see, the prosperity of Upper Silesia was coupled with that great adventure we call modernity.

Upper Silesia was marginalised and overlooked by its rulers — Poles, Czechs and Austrians — for a long time. It was only Prussia, which emerged in Europe in the early 18th century, that changed its fate for the better. Pressing ahead in Central Europe, Prussia desired to become a modern state based on efficient administration and an even more efficient army. It was Upper Silesia where it saw an opportunity to realise these ideas. Prussian king Frederick the Great's plan involved creating a modern industry in the region — to serve as backup for the Prussian Army, and also to provide goods that could compete with British-made products. In the mid-18th century, Prussia deprived Austria of almost the whole of Silesia, and left it only a small piece of the province.

The Great Industry

Around the year 1800, Upper Silesia began a revolutionary transformation to gradually outdistance other regions, and soon also the whole of Central and Eastern Europe, in terms of economy and civilisation!

How did it come about? The Industrial Revolution — with the steam engine as its symbol — was taking place in Britain, where most inspiration came from. The Age of Steam was fuelled by coal, and whoever possessed coal deposits profited from the new technology. And if they possessed other minerals as well, they could become as wealthy as Croesus. The clever political tactics of the Prussian government and appointing the right people in the right place were no less important factors. One such person was Count Friedrich Wilhelm von Reden, who developed and implemented an industrial development plan for Silesia.

1790 turned out to be a successful year in the search for coal, as huge reserves were found in the vicinity of Zabrze. Coal mines were built to supply the steelworks with fuel. Metallurgy was soon to be aided by production of coke, which is essential for the production of iron and zinc. This was complemented by an elaborate transport infrastructure, based not so much on roads as on adits and canals. Its most important element was the Klodnicki Canal — opened in the early 19th century — which connected Upper Silesia with the Berlin waterways and the Baltic Sea via the Oder River.

Nearly half a century passed before the water transportation system had competition, namely, railways. The Upper Silesian Railway, connecting the region with Wroclaw and Berlin, was opened in 1846. One year later, it was connected to the Warsaw-Vienna railway, and the following year to the Austrian Northern Railway.

The Upper Silesian rail hub immediately attained supra-regional importance, linking North and South, East and West; the Baltic Sea, the Adriatic Sea and the Black Sea. Furthermore, it connected the empires: Prussia, Austria and Russia, the borders of which met close by, at the so-called Three Emperors' Corner — further proof that superpowers were interested in this inconsiderable but affluent region.

The Seed of Modernity

The technological and economic leap forward completely changed the region's landscape. Never before known devices emerged, such as an innovative steam engine serving the dehydration of the Silver Mine in Tarnowskie Góry — the first one ever in this part of the continent! Launched in 1788, it was such an oddity that even Johann Wolfgang von Goethe himself visited Silesia to see it, two years later.

Mid-19th century prints by Ernst Wilhelm Knippel depict the steelworks and foundries in Silesia as fire-breathing monsters that travellers watch, transfixed. The German precursor of Impressionism Adolph Menzel was fascinated by the fire and heat as well. His *Iron Rolling Mill*, painted in Królewska Huta, is his contemporary take on the forge of Hephaestus — in fact, the painting is also known as *Modern Cyclops*. Menzel's admiration for the dark magical aura surrounding the iron mill seems similar to the way in which William Turner depicted the force of the elements. A revolution was taking place above, but — first and foremost — below ground, as represented by the photographer Max Steckel, who wandered with his camera around underground tunnels, the wonders of Upper Silesia resembling Ali Baba's cave.

The landscape of Upper Silesia was not shaped exclusively by the four elements: Fire, Earth, Air and Water. It is living proof of something more profound, which we might call the seed of modernity. The seed which was planted there next to Frederick the Great's dreams of the perfect province — a paragon of technology, geometry, discipline, law, tolerance, and reason. The following epochs have not written off this Enlightenment ideal. On the contrary, they have enriched it with the power of imagination and art.

Katowice

Industrialisation initiated the process of urbanisation on a colossal scale. It triggered the development of already existing towns like Gliwice or Bytom, but, above all, gave rise to new cities, such as Królewska Huta (Königshütte)or Katowice.

Katowice is special in that it was founded by just one person. In 1839, Franz Winckler purchased the village of Katowice and made it his administrative headquarters. He appointed his friend, Wilhelm Grundmann, administrator of the estate. Thanks to Winckler, a railway and station, and then also the Upper Silesian Railway Administration Building, were built in Katowice.

Unlike Królewska Huta (meaning "the royal foundry"), the name of Katowice does not imply its origin. But it would not be an exaggeration to say that it arose from a railway station. And it developed very fast. The arrival of the 19th century was celebrated by three hundred inhabitants; by the end of the century the city's population numbered fifty thousand. In 1865 the Prussian king bestowed municipal rights on Katowice.

The co-existence between cities and mining and big industry was not merely the foundation of their prosperity. New technologies, large-scale exploitation and production, as well as a great inflow of people, necessitated the search for bold new inventions. In spite of appearances, the pioneering spirit of big industry survived unbroken despite the bourgeois character taken on by the Silesian Conurbation. Silesia remained a region of bold technological, social, and architectural experiments.

Industrial Cathedrals and Black Gardens

Among the numerous examples deserving of special mention here are the amazing

buildings designed by the eminent Berlin architects Emil and Georg Zillmann.

Szombierki Power Station was opened in 1920. It is often referred to as the "industrial cathedral". The hall complex is dominated by a clock-tower with a four-sided Siemens & Halske clock. There are also three 120-metre brick chimneys — the tallest in Europe.

During the interwar period, Szombierki was one of the tallest power stations in Europe. Its brick building has often been compared to Malbork Castle, because, reportedly, they were constructed using the same number of bricks. Malbork, the largest brick castle in the world, was designated as a World Heritage Site by UNESCO. Other monumental relics of technology, like Tate Modern in London, have been successfully reinvented. The future of the now defunct power station in Szombierki, however, is yet to be determined.

Alongside the "industrial cathedrals", "black gardens" came into being. This term has been applied to working-class housing estates inspired by Ebenezer Howard's concept of the Garden Cities of Tomorrow. In Silesia garden cities did not remain an unrealised utopia. Cousins Emil and Georg Zillmann designed two such housing estates in Katowice — Giszowiec, surrounded by green areas and forests, and the red-brick Nikiszowiec. They created them not only to provide good living conditions for the workers and their families, but also to express — through architecture — ideals of harmony between work and family life, social order, and a balance between technology and nature.

The City in Motion

If you take a look at Giszowiec, where amid the few surviving houses of the garden city multi-storey tower blocks from the socialist period soar upward, you will see a unique feature of Katowice, which might be called the "city in motion", in a sense that every few dozen years over its short history the city has often been remodelled and reinvented. And, by negating the previous epoch altogether, each of these breakthroughs disrupted the continuity of collective memory.

The first breakthrough occurred after World War I, when the national status of Upper Silesia was not satisfactorily resolved — and it became a bone of contention between the reborn Poland and the Weimar Republic, which emerged on the ruins of the Second Reich. The dispute was finally settled by a plebiscite carried out in 1921, when the easternmost portion of Upper Silesia (including Katowice) was awarded to Poland, and its western part to Germany.

An organic unit was drastically torn up — and divided among mutually hostile states. This resulted in the border having amost unusual shape, due to which the entire communication system and all economic connections had to be reorganised. Somewhat paradoxically, the process had a positive effect as well. Upper Silesia became a centre of interest for the public opinion and the authorities of both countries.

Forward Escape

Reborn Poland made at least part of its two dreams come true, that is to say, it gained access to the sea and the riches of Upper Silesia. Katowice became the capital of the new, autonomous Silesian Voivodeship. The authorities, however, now had to face a psychological problem, so to speak. Katowice was a German city through and through, so a Polish identity needed to be developed. For this reason a decision was taken to get rid of Gothic architecture, which brought to mind "all things Prussian", in favour of a monumental classicism that was then regarded as typically Polish. Hence the Silesian Parliament came into being, the headquarters and the symbol of new Polish authority. Intended as "national", the edifice turned out artificial and the inhabitants of Silesia saw it as oddly inexpressive. The synthesis of modernity and Polish tradition simply did not work. Therefore it was decided that radical and creative steps should be taken, namely,

to create ultra-modern architecture, without referring to any tradition whatsoever!

Architecture became part of the programme of the new authorities, who insisted that Polishness in Silesia evoke American-style modernity, activity, grandeur and growth. Poland's first skyscraper — a 14-storey, 50-metre tall building — was erected in Katowice. To the south of the Prussian city centre a new centre emerged with public buildings and "American-style" apartment houses combining simplicity with luxury: lifts, refrigerators, winter gardens, great design, sophisticated materials.

The crowning achievement of this trend was the Silesian Museum, a huge complex aiming to break the notion of museum as art sanctuary. It was completed in the summer of 1939, but did not open due to the outbreak of war. The German occupants saw modernity as the symbol of Polishness as so impudent that they decided to immediately dismantle it — and employed a group of Auschwitz prisoners to do it.

The situation on the German side of the border was very similar. An effort to manifest Germanness through an architectural style resembling the classicism of the Age of Goethe was a misconceived idea, because it did not solve actual problems. And those were : providing accommodation for large numbers of people — veterans of World War I and displaced persons from lands now belonging to Poland — and creating a new centre for the region, because Katowice wasnow part of Poland. To cope with the former, designers from the Bauhaus school and the Deutscher Werkbund were employed. Bruno Taut, with his concept of social housing — which was inexpensive but functional and modern, standardised but never soulless — left an indelible mark on Silesian architecture. Designers experimented with different types of apartments to find optimum solutions securing good living conditions : a kitchen with a window, a balcony, a bathroom. The form was dictated by function — plain, unassuming and simple, also with regard to materials : steel, brick and reinforced concrete. To cope with the latter problem, a bold urban planning concept — a tri-city comprising Gliwice, Bytom and Zabrze — was devised but failed, because the war broke out.

Apart from German designs triggered by this idea to create a highly modern housing environment, truly outstanding architectural works emerged, such as merchant Erwin Weichmann's Textile House in Gliwice, designed in the Expressionist style by the young Erich Mendelsohn, and St. Joseph's Church in Zabrze by Dominikus Böhm, which brings to mind an Early Christian Basilica in Constantine the Great's Rome, and, at the same time, a shop floor.

We want to be Modern!

After the Second World War, Poland experienced two great movements. The first resulted from decisions taken in Yalta, which caused the country to shift to the west. Poland lost almost one third of its pre-war territory to the Soviet Union, while gained regions previously belonging to Germany. Before the war, Upper Silesia was divided between Poland and Germany. After the war, all of it became part of Poland. The second movement was caused by the post-war reconstruction, industrialisation and urbanisation. These triggered mass migrations from the countryside to the cities. Upper Silesia, centred around Katowice, became the most important, largest and most modern production centre in the country. Demographics provide a good picture of the changes: in 1945, the population of Katowice numbered about 100,000; in 1955 it was 200,000, and in 1970 some 300,000. The interwar centre in the southern part of the city proved inefficient, also for ideological reasons. Katowice had to be reinvented. This time in a socialist – not American-way !

In 1954, a decision was taken to create a new centre in the northern part of the city. Planning work dragged on until 1962, with the fortunate result that socialist realism left

virtually no mark on Katowice. The phase of designing architecture took place after the Khrushchev liberalisation, which gave the green light to building "modernist in form and socialist in content". The Soviet Union wanted to present itself as the most modern country in the world, ready to overtake the United States. Poland wanted to catch up with the Soviet Union, and Katowice was supposed to be its showpiece.

The main feature of the new design was a boulevard and at the same time vista axis — Red Army Avenue, starting from the Market Square remembering Prussian times and ending in a sports arena. A communication route, and above all, so to speak, a visual landmark, the *prospekt* raised the prestige of Katowice and lent it a metropolitan feel.

The old market square changed completely when, in the early 1960s, the Zenit Department Store (Poland's first building with a curtain wall) and the Silesian Press House were erected on it. Ten years later, the Skarbek Department store was built there as well. By the early 1970s, a new building emerged along the axis — the Separator, that is the Main Office for Coal Studies and Processing, the arcade with a branch of the Bureau for Art Exhibitions and a registry office, and also Superjednostka (Super Unit), a Silesian equivalent of Le Corbusier's United habitation — 762 apartments for 2,823 people, 15 storeys, 187 metres long. Superjednostka rests on reinforced concrete *pilotis* that prevent it from damage caused by rockbursts, but, more importantly, support the ground floor,which allowed the building to fulfil one of Le Corbusier's principles — the principle of freeing the horizon.

The perspective of the boulevard is closed by the Sports and Entertainment Arena "Spodek" (the Saucer) from 1971, balanced by the vertical slab-like edifice of the Regional Directorate of State Railways, where for the first time in Poland the open-space concept was used, and by the beautifully sculpted Monument to the Silesian Uprisings.

If the axis as a whole was meant as Katowice's answer to the Champs-Elysées and the roundabout ending it as a kind of Place de l'Etoile, where traffic from all parts of the city would converge — then giving the sports arena the shape of a spaceship suited the starry concept of the project. But it rather should be interpreted in the context of the Cold War-era battle for supremacy in space : it is no accident that at the end of Red Army Avenue an architectural sputnik landed on the 10th anniversary of Yuri Gagarin's flight. And became the icon of the city.

The urban and architectural creation of the new centre of Katowice has remained unparalleled in post-war Poland.

Modernist design in the spirit of Le Corbusier helped to make Katowice a city of greenery, sun and air. One example is Osiedle Tysiaclecia (the Millennium Housing Estate), built between the early 1960s and the mid-1980s. Originally intended to accommodate 30,000 people, it consists of tower blocks — the tallest of which are five 25-storey "Corncobs" — and is, in fact, a city within a city, including shops, kindergartens, schools and healthcare centres immersed in greenery, a faithful embodiment of the Athens Charter. The estate is adjoined by the Silesian Park of Culture and Recreation arranged in the 1950s and 1960s, on reclaimed spoil heaps covering 620 hectares. It is one of the largest city parks in Europe and one of the first major attempts to revitalise post-industrial areas. The "Green Lungs of Silesia"are not only the Silesian Park and the forests surrounding the Katowice Agglomeration, but also the nearby Beskidy Mountains, which were turned into a Silesian hinterland of tourism, recreation and spa facilities. They abound in great architecture, such as the famous pyramid-shaped sanatoriums in Ustroń designed by Henryk Buszko and Aleksander Franta, creators of the Millennium Housing Estate. I am not quite sure whether Buszko and Franta could be called the Zillmanns of the late 20th century. One thing is certain, however : Upper Silesia has become a garden again.

Emerging Perspectives in the Study of Cultural Significance of the Ancient Cities: A Brief Note on Varanasi

Binda Paranjape
Banaras Hindu University, Varanasi

I will be presenting following three major perspectives in the context of Varanasi:

1. Historical perspective: Varanasi being one of the ancient most cities in the world having a continuous history of human habitation for over 3000 years.
2. Perspective of the knowledge seekers, especially related to traditional knowledge: Culture of Varanasi being diverse and enigmatic. The most vibrant tradition is of intellectual dialogues, discussions and production of texts.
3. Development perspective with a Smart City model that has a top down approach: Varanasi as a part of Smart Cities Mission that was launched by Prime Minister Mr. Narendra Modi on 25 June 2015. Varanasi was included in the third list of proposed smart cities in 2016.

I

History of natural and artificial water bodies, religious places having shrines and monasteries, creation of stepped approaches to the river, known as 'Ghats' shows a variety of constructions in Varanasi. Many have survived the shocks of time and are holding at least some traces of their high antiquity. The archaeological sites of Rajghat and Akhta where the excavators could find a continuous sequence of habitation, approximately from the early historical period (twelve/eleven century B.C.) up to the periods of great empires (5/6 century A.D.) is very significant. These findings corroborate the literary evidences and help in drawing a complete picture of human activity in this region. The excavated artefacts show a lot of commonality in features with the artefacts found from the other regions of the Gangetic plains. Terracotta clay figurines, pottery, metal objects are found in association with the habitation sites, indicating their use by the local communities. The excavated site of Aktha, near Sarnath, has been identified as the ancient Rishipattana, where the sages used to gather (*Rishi* means a sage). During the later Vedic period this became the place of Vedic learning and rituals, where Buddha came and gave his first sermon. Traditionally Sarnath is identified to be the place of ancient Rishipattana, however, the earliest datable archaeological remains of Sarnath are not traceable to a date earlier than the third century B. C. that is the period when the Mauryan king Asoka undertook massive construction activities by way of Stupas, (Buddhist Relic mounds), pillar with a message to the Buddhist monastery and monastery buildings. The earliest dates for the archaeological remains at Aktha near Sarnath are datable to centuries before Sarnath. This has prompted the archaeologists to identify Aktha with the ancient settlement

of Rishipattan, where the Buddha gave his first sermon. The excavated site of the Rajghat region of Varanasi shows a gradual development towards an urban culture from the eighth century B.C. onwards. The sites in the nearby regions must have been the rural hinterlands giving a steady supply of agricultural produce, craft commodities, and special services like that of stone cutting. The explorations within the city area of Varanasi have shown the orientation of the development of habitation areas. Evidences of coins, seals, and sealings also indicate the commercial activity of typical urban nature. The weaving of a fine variety of cotton and silk yarn as a special export from Varanasi is often found in literary sources. Excavations have yielded terracotta spindles supporting the literary evidence of spinning and weaving activity having very high antiquity.

Throughout the historical period, Varanasi remained an important commercial centre. It was well connected with land route and seas route. Ganga provided an easy channel for transportation towards the Bay of Bengal, linking Varanasi with South-East Asia and China throughout the Ancient period. The Chinese pilgrim Xuanzang visited Sarnath in the seventh century A.D. where he saw a large number of monasteries and monks residing there (30 monasteries and 3000 monks). His impression of Varanasi was that of an urban center, densely populated by wealthy people. He also seems to have seen hundreds of temples mostly dedicated to Shiva. Throughout the medieval period a number of travelers from Arab, Persian, and European worlds visited Varanasi. Al Biruni came to India in the eleventh century and stayed at Varanasi. His observations regarding the learned brahmins are mostly based on his experiences in Varanasi. Francois Bernier, a French physician travelled through India in the seventeenth century. He visited Varanasi and has left behind a vivid description of this city. He compares Varanasi with the Vatican. Similarly Jean-Baptist Tavernier, a French Gemstone merchant also has written a graphic account of seventeenth century Varanasi.

Christian missionaries from England of the eighteenth and nineteenth centuries also have written extensively on Varanasi. The accounts of Bishop Heber (Christian Missionary Society) and James Kennedy (London Missionary Society) came to Varanasi to discharge the missionary duties assigned to them. Both considered Varanasi to be the living text of Hinduism and its bedrock. Many memoirs of the foreigners visiting Varanasi are available for contemporary scholars to understand how this ancient city revealed itself to the persons who came from a totally different cultural background. One thing that is common to most of the memoirs is that this city has an enigma of being very very ancient. This feeling is best expressed by Mark Twain, the famous American writer who visited Varanasi during the last decade of the nineteenth century (1896). For him the city looked," older than tradition, older even than legend and looks twice as old as all of them put together."

II

One of the biggest strengths of Varanasi is its intellectual tradition, popularly known as 'Panditya Parampara'. The Sanskrit scholars from Varanasi created (Pandits) and nourished it over centuries producing huge corpora of knowledge in different branches of study. In the year 1983, one of the Pandits of Varanasi, Baldev Upadhyaya published a compendium of the scholars from Varanasi, mainly datable between 1200 to 1950 that ran into more than 1000 pages. The list appears to be unending. Though the book focuses on the lives of scholars from the twelfth century onwards Upadhyaya has mentioned many from the earlier date as well. With the establishment of the college for Sanskrit learning during the colonial period Varanasi became an important center for Sanskrit learning where a large number of European philologists and Indian scholars of

Sanskrit started enriching the discourses on language with its multiple aspects. In the field of Sanskrit grammar, Philosophical schools of Vedic tradition and the codes of moral and religious conducts called Dharmashastras, the Pandits of Varanasi were looked as an ultimate authority, because of which Indians from each and every part of the subcontinent came to Varanasi to study and participate in the scholarly dialogues with the experts in the field. There are a number of popular stories regarding the exhibition of the unchallenged position of a number of scholars.

One of the landmark events in the history of the intellectual tradition of Varanasi appears to be the arrival of Gautama the Buddha to Rishipattana. This place as it is shown earlier in this paper is identified with an archaeological site near present Sarnath. Gautama Buddha, a person born in present Nepal, moved to different places in search of knowledge, finally gained it at Gaya, situated in the present state of Bihar, and came to Varanasi to share it for the benefit of the entire humanity. The question is about the choice of this place. It must have been because this was the stronghold of Vedic tradition that Buddha was contesting. It is not just the literary stereotype that the stories about the previous births of the Buddha, known as Jataka stories, where the principles of Buddhism like compassion are highlighted, start with the place Varanasi. The place of the birth of a Bodhisatva, that is future Buddha being Varanasi and the family of Bodhisatva being the family of the high priests, appears to be an attempt to give authenticity to the story. Buddhism continued to flourish at Sarnath for more than fifteen hundred years if not more. Throughout this period Varanasi continued holding its positions as a great center of learning primarily of Vedic tradition. There must have been occasions when these two apparently opposite traditions had confrontations, but unlike some other places in India where Buddhism faced a severe, almost violent opposition, in Varanasi both continued to prosper side by side for centuries.

Approximately two centuries before Buddha, Parshvanath, the twenty-third Teerthankar, (an enlightened being) of the Jain tradition was born in Varanasi and also had received the ultimate knowledge, 'Keval Jnyan', at Varanasi. Parshvanath preached the four major principles of Jainism viz. Truth, Non-violence, Non-stealing, and Non-hoarding. In the scheme of this preaching opposition to the contemporary practices of animal sacrifice is intrinsically included. Thus it was not that Gautam Buddha was preaching the principle of non-violence for the first time. In other words, Gautam Buddha came to Rishipattana, that is in close proximity of Varanasi to preach his principles to such audience who must have the knowledge of Vedic and Jaina principles both. Jainism and Buddhism both seem to have flourished at Sarnath, however, historical evidence of existence of Buddhism with a number of monasteries and Buddhist monks lived there or visited the monasteries, comes from a number of historical evidences, that is not a case for Jainism.

Another star shining on the intellectual horizon of Varanasi is Adi Shankaracharya. Varanasi always had been a stronghold of the Mimansa school of Indian philosophy. Shankaracharya, an upholder of the Vedanta philosophy came to Varanasi where he held sessions of dialogue with the followers of the other schools of philosophy and established one of the prominent religio-philosophical institutions of Vedanta order. Shankaracharya severely challenged the philosophical postulates of Buddhism and completely extinguished the fire of Buddhist thought. Vedic supremacy was firmly re-established by this movement. No wonder after the travel of Shankaracharya to Varanasi, the Buddhist center at Sarnath also gradually went into oblivion as was the case of a number of Buddhist establishments from the other parts of India. The exact time of Shankaracharya's visit to Varanasi and an establishment of Shankar Math, the monastic institution for

the spread of Vedantic philosophy, is under debate but it certainly was not before eighth century and not later than eleventh century.

The willingness to indulge in scholarly discussion and enthusiasm to know more as a characteristic feature of the scholarly tradition of Varanasi is also testified by Al-Biruni, the famous scholar of the Persian intellectual world who visited Varanasi in the eleventh century. Mughal ruler Shah Jahan's son Dara Shukoh (seventeenth century) studied Sanskrit at Varanasi from a Pandit of high social and intellectual position. He translated some important philosophical works from Sanskrit to Persian. The same tradition can be seen continuing during the late nineteenth century when Henry Steel Olcott came to Varanasi to establish a center of Theosophical society in this ancient city. A meeting of scholars was arranged to get introduced to the principles of this new school of philosophy. Annie Besant was welcomed in Varanasi where she established institutions for grooming the young Indian minds in their own glorious tradition of true knowledge. J. Krishnamurti, initially a torch bearer of Theosophy, parted his ways from Annie Besant and established another school of thought at Varanasi. There are descriptions in the contemporary literature of large crowds gathering to listen to the sermons of J. Krishnamurti. Even a cursory glance at the titles conferred upon the persons of achievements in Sanskrit studies by the scholarly circles and academies of Varanasi amply shows the variety of branches of knowledge studied at this city. Some of the titles indicative of expertise in various fields of study are Tarkavachaspati, (An expert in arguing with the logic of the Nyaya school of philosophy), Yogisamrat,(emperor in the studies of Yoga, mainly the theoretical aspects of Pantanjali Yoga), Vaiyakarana - Kesari (lion among the grammarians), Nyayaratna (Jewel of Nyaya philosophy), Jyotishmaharnava (Great ocean of the knowledge of astrology), Sahityavachaspati(An expert in critical evaluation of the Literary texts). A study of these titles in a historical perspective can yield more information regarding the stages in the development of certain schools of thought in Varanasi. One of the interesting facts regarding the conferment of titles to these scholars is related to the colonial rule in India. Mahamahopadhyaya as a title was instituted by Queen Elizabeth on the occasion of Golden jubilee of her accession to the throne to promote traditional learning in India in the year 1887. In the year 1917 an annual amount of Rupees 100 was sanctioned for the Mahamahopadhyays. There is a long list of scholars from Varanasi who became Mahamahopadhyay.

The vibrant intellectual activity at Varanasi can be testified by huge collections of manuscripts coming from Varanasi. Banaras Hindu University, Sampoornananda Sanskrit University and many monasteries in Varanasi have thousands of Sanskrit manuscripts in their possession. It is impossible to talk about the hundreds of texts composed by the scholars of Varanasi over a period of minimum thousand years but one can sense the enormity of material available for the contemporary researchers in the field of Sanskrit language and also in the subjects related to linguistic and philosophical studies.

One of the greatest visionaries of the colonial period was Pandit Madan Mohan Malaviya. He founded a great center of learning at Varanasi, the Banaras Hindu University. His vision was to train the Indian youth in the traditional knowledge along with the western scientific knowledge. This openness towards the western knowledge was not very common amongst the Pandits of Varanasi, however, they were having a deep appreciation for Madan Mohan Malaviya. Thus Banaras Hindu University could attract many Sanskrit scholars not only of Varanasi, but from different parts of India and the neighbouring state of Nepal.

While remaining absolutely committed to their ancient texts, Pandits of Varanasi in the time of crisis supported the progressive

thought of the reformers. May it be the issue of widow remarriage or the age of consent, the Pandits of Varanasi brought forth the textual testimony in favour of the reform. There are occasions when women also received the traditional knowledge, which by and large was not recommended for them. Panini Kanya Mahavidyalay of Varanasi is one of the best examples of it. Women of this school get training to become the officiating priestesses, a field by and large considered to be reserved for the men. In the year 1936 Mata Anandamayi, a woman saint organized a sacred thread ceremony for two of the women followers of hers that gave them the right to study the sacred Sanskrit texts. Subsequently she also established Kanyapeeth for women to get traditional knowledge of scriptures along with the modern subjects.

No discussion on the intellectual tradition of Varanasi will be complete without mentioning Kabir (fifteenth century) and Goswami Tulasidas (sixteenth century). The former being a mystic and the latter being a devotional poet. Both have exhibited a great understanding of the traditional philosophical knowledge and have influenced the generations to come. Both chose to compose their works in Non Sanskrit languages. Ramacharit Manas of Tulasidas and Bijak of Kabir are held in very high esteem, no less than Sanskrit. Kabir and Tulasidas may be considered as the brightest stars of the non Sanskrit tradition, however there are many more luminaries of this tradition having Varanasi as their abode.

The vast treasure of information regarding the intellectual tradition of Varanasi needs to be studied thoroughly before some threads are lost in the mega projects of total transformation of the physical and to some extent the cultural identity of Varanasi. In the wake of smart city endeavour, it is high time to focus on an in-depth study and documentation of the physical and literary evidences of the intellectual tradition of Varanasi.

III

Mr. Narendra Modi while filing his nomination from Varanasi for the elections of the lower house of Indian parliament (Lok Sabha) in 2014, addressed a huge crowd of the supporters saying that no one has sent him here, nor has he come on his own, it was the call from Ma Ganga, that he came to Varanasi. He expressed his wish to see Varanasi as a spiritual capital of the world. After winning the elections from the Varanasi constituency Mr. Modi became the Prime Minister of India, the office he has retained since. In the capacity of being the Prime Minister he launched the most ambitious project of 'Smart Cities'. Initially Varanasi was not in the list, however soon Varanasi was included and mega projects started getting executed, changing the urban landscape of this ancient city. Recently, the most spectacular event of opening of the Kashi Vishwanath Corridor created a great stir in the minds of the beholders. Here is a political leader who is committed to change the age old perception about Kashi, that it is a place of chaos and various kinds of hardships, considered tore inevitable, in this supremely blessed spiritual place. The project of changing the ancient Kashi in to a smart city is all filled with dreams of creating ease of doing business, where pilgrimage and tourism are expected work as complementary activities. Kashi will be showcased to the world community by the river front. Handicrafts, cuisine, performing art, visual art, marshal art, buildings, live performances like that of Ramleela, each and every such thing that will bring more prosperity in the economic terms will be promoted. The youth do not have to migrate out in search for jobs, they can use their talent in the city itself because the smart city will open up multiple job opportunities. Every aspect of life will be transformed, because the perception about the place of living is changing. It is worth developing ways to see how the inhabitants of this ancient city look at

these changes. In that sense this webinar has been organized in the most appropriate time. What exactly is changing? Are there elements that are likely to remain unchanged? It is stressed upon over and again that the prime importance of Varanasi is of being a religious place of Hindu pilgrimage. Taking a dip in the river Ganga at Varanasi and visiting the temple of Kashivishvanath is believed to ensure the salvation, if not in this bodily form, at least after the death. In this scheme of religious aspiration, order or chaos does not matter. On the other hand the 'smart city' project is all about bringing order and comfort in the lives of the people in the city, more so in the lives of business and trading community. For those who are planning for the ultimate salvation, the faster means of digital world or obstacle free roads are not the priority, in fact that as a demand is non existent. Ideally speaking pouring water on innumerable idols, singing the praise of the God or chanting simple lines of the name of the God, having a small quantity of food item as share in the offering to the God, are a few of the things that one asks for in this place.

The smart city project appears to be at the cross roads having multiple points of intersection. A city that is supposed to be having religion and spirituality as its guiding principle is brought under the rubric of the technology-driven model of development. It is like a massive roller set out to flatten all the uneven surfaces. The commercial value of each and every cultural artefact is to be enhanced by smartly displaying it for the potential buyers. Creating a sense of inferiority complex in the minds of the local inhabitants by highlighting the weaknesses of their traditional life style, seems to be a biggest challenge. Filth, traffic chaos, haggling as a rule at the small purchases where cheating is considered to be a necessary part of business and many such practices are to be pointed out as obstacles in the progress. The structural adjustments affecting the lives of the local inhabitants are to be seen as necessary evils for a long term benefit of all, the locals and the visitors alike.

Major expertise required for the mega project of turning an ancient city in to a smart city is not available locally. Hence, the major contracts of the works involving a huge amount of money will go to the outsiders who become the main players in the bidding. In case of Varanasi the local expertise is in the religious rituals, reading the horoscopes, displaying devotion in multiple ways of performing art, arranging huge processions of idols of the Gods, arranging spectacular shows of recreating mythological scenes that was carried forward for generations with a harmonious blend of tradition and real time. Under the design of the smart city, the spontaneity of such traditions going hand in hand with tradition will face a challenge of meeting the needs of the culture of sponsorship. Sponsorship depends on the results of the market research. There is an assessment of what would sell and what will not. Dividends counted in terms of spiritual bliss and the joy of the devotees is not smart enough for the smart city project. While inviting the citizens of Varanasi to give their suggestions for the development of the city as a smart city, the Municipal Corporation of Varanasi (Varanasi Nagar Nigam) placed a vision document before the public. The document stresses upon maintaining the cultural significance of Varanasi over and again while mentioning the changes that are likely to take place. It will not be out of place here to quote two points of the document. As vision no. 7 it states, "Create a new Varanasi on a grand scale of Hindu religion as Vatican is to Christian religion and Ghats should be the most scenic place in the world. Cleanliness, Greenery, Infrastructure, education medical hub should be of world class structure." Vision no. 8. "Urban planning with quality of life for the citizens, decentralized system and incentive for innovative use of land. Promoting environment of Ganga for sustainable growth. Moving from old city to

new city with the use of technology."

Sarnath received liberal patronage from countries like Thailand and Sri Lanka, as a sacred space for the Buddhist. Similarly both Sarnath and the main city of Varanasi has received a good amount of contribution from Japan since decades before the Smart City Project. Recently a huge complex called Rudraksha: International cooperation and convention centre came in to existence at Varanasi with Japanese collaboration. A similar collaboration is expected to take shape between India and China under the auspices of the Shanghai Cooperation Organization by way of declaring Varanasi its cultural and tourism capital. Thus Varanasi is offering good opportunities for strengthening the ties with many countries of the world.

Newspaper 'Times of India' on 17 January 2021 reported a statement of the municipal commissioner of Varanasi. It says, " The city has won the distinction of getting top rank for performing well in the execution of development projects. The ranking has been done on the basis of completed projects and the progress of ongoing projects." The pace at which Varanasi is changing demands an immediate attention of all the scholars of social sciences for assessing the enormity of impact of these 'development projects' on the life of people by and large. What remains 'as it is' at least externally, what is archived for future prospects and what is transformed or destroyed needs to be carefully studied. The process of change has begun at a very high speed with a smart justification of fulfilling the long awaited dream of making Varanasi the 'Vatican' of the Hindus, hence there is also a time when a critical question about how Varanasi was attracting Hindus: rich or pauper, illiterate or highly educated and the best of the minds of Europe, Asia and America by way of musicians, painters, poets, philosophers, philologists for centuries before it began to be the clean, green, tech-savvy and 'Smart' ?

Following sources are used for this summary

Books

Agnihotri, Prabhudayal: *Patanjalikalin Bharatvarsh* Bihar Rashtrbhasha Parishad, Patna, 1963.

Jaiswal, Vidula : *Ancient Varanasi An Archaeological Perspective* Aryan Book International, New Delhi, 2009.

Mimansak, Yudhishthir: *Sanskrit Vyakaran-Shastra Ka Itihas* 3 Volumes. Ramlal Kapoor Trust, Sonipat, Haryana, Vol. 1947, Vol.II,1962, Vol. III, 1973.

Upadhyay, Baldev: *Kashi Ki Panditya Parampara*. Vishvavidyalay Prakashan, Varanasi, Third edition, 2016.

Articles

Bakker, Hans: "Construction and Reconstruction of Sacred Space in Varanasi". *Numen*, Vol. 43, No. l, (Jan.1996) pp. 32-55.

Banerjee, Moumie: "Nineteenth Century Banaras: Changing European and Indigenous Images". *Proceedings of Indian History Congress*, Vol. 66 (2005-2006) pp. 968-973 Kutluturk, Cemil: "Significance of Varanasi in terms of Indian Religions". *IOSR Journal of Humanities and Social Science* (IOSR-JHSS), Vol. 10, Issue 2, (Mar-Apr 2013), pp. 36-40. Mishra, B. N. (ed): Articles by various scholars in Pandit Revisited. Sampoornananda Sanskrit University, Varanasi, 1991.

Pollock, Sheldon: " New Intellectuals in Seventeenth century India". *The Indian Economic and Social Review*, 38,1 (2001). Sage Publications, New Delhi.

"Is There an Indian Intellectual History? Introduction to "Theory and Method in Indian Intellectual History."" *Journal of Indian Philosophy*, October 2008, Vol.36, No. 5/6, pp. 533-542.

Roy, Souvanic: " The Smart City Paradigm in India: Issues and Challenges of Sustainability and Inclusiveness". *Social Scientist*, Vol. 44, No. 5/6 (May-June 2016) PP. 29-48.

News items from the following Hindi Newspapers were also used.

Amar Ujala, *Dainik Jagaran*.
English Newspapers: *Times of India*, *The Hindu*.

অনন্য প্রয়োগশিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর

অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
স্থপতি

আন্তর্সম্পর্কযুক্ত প্রয়োগশিল্প ও পরিবেশ সখ্য নির্মিত পরিবেশ—বর্তমান শতাব্দীতে দেশে বিদেশে, ভঙ্গুর ও ভগ্ন পরিবেশ অবস্থায় বিশেষ প্রাসঙ্গিক। যদিও দেখা যায় গত শতাব্দীতেই এই প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে ও প্রেরণায় নির্মিত পরিবেশ নিয়ে সামগ্রিক কাজ হয়েছিল, শান্তিনিকেতনে-শ্রীনিকেতনে। এখানেই প্রায় একই ছন্দে সৃষ্টির কাজ করেছেন—বিখ্যাত শিল্পী ত্রয়ী—নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর ও কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৬২-৬৩ সাল থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রুক্ষ ধূসর শুষ্ক মরুপ্রান্তরে—বোলপুর ছাড়িয়ে গ্রামের মধ্যমায় —শান্তিনিকেতন পরিবেশ -স্থাপত্য গড়ে তোলেন। ভারতের নির্মিত পরিবেশ চর্চায় যা ছিল ঐতিহাসিক। *বিশ শতকের ভোর* (১৯০১) থেকে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে আশ্রম বিদ্যালয়ের আয়োজন গড়ে উঠতে লাগত। পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই আশ্রম স্থাপত্যের বিস্তার করেছেন। একই সাথে পিতার নির্মিত পরিবেশ ঐতিহ্যের সংরক্ষণও সচলায়িত করেছেন। ভারতে সে সময় ব্রিটিশরাজ স্থাপত্যের প্রবল দাপট সত্ত্বেও প্রকৃতি, পরিবেশ সখ্য শান্তিনিকেতন স্থাপত্য স্বকীয়তায় এগিয়ে চলে। কলকাতা ছাড়িয়ে বোলপুরের ডাঙার মাঠে পর্ব থেকে পর্বান্তরে সবুজদ্বীপের মতন আকারাধিত দর্শন সৃষ্টি হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। কাছের গ্রামের ও সাঁওতাল গ্রামের মানুষেরাও যুক্ত হয়েছিল, পরিবেশ রূপায়ণ কাজে। মানুষ, ভূমি ও পরিবেশ যেন অনেকটাই প্রকাশিত হয়ে চলেছিল দৈনন্দিনে। সৃষ্টি কাজেও। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বের।

রবীন্দ্র আদর্শে শান্তিনিকেতনে পরিবেশ রূপকার-ত্রয়ীর (নন্দলাল, সুরেন কর ও রথীন্দ্রনাথ) ছন্দোময় স্থাপত্য ও পরিবেশ নির্মাণ শিল্পের কাজ এগিয়ে চলে ১৯১৭-১৯১৮-এর পর থেকে। এই তিন শিল্পীই ছিলেন বহুমাত্রিক প্রয়োগ শিল্প প্রতিভা ও নিভৃতচারী। কাজ দেখলে বোঝা শক্ত, কার কতখানি ভূমিকা! সৃষ্টিকে সামনে রেখেছেন; তিন স্রষ্টাই নিজের নিজের পরিচয় প্রায় দেননি বললেই চলে। সমন্বয়ী ছন্দে স্বাধীন ভারত স্থাপত্য সংস্কৃতি পথের সন্ধান করেছেন। সামান্য আয়োজনেও, প্রভূত অর্থসংকট মাঝে। এমন সার্থক ত্রয়ীর পরিচয় পাওয়া যায় প্রত্যক্ষ স্থাপত্য ও পরিবেশ নির্মাণশৈলীতে ও নিবিড় অনুধাবনে। ভারতীয় স্থাপত্য-ঐতিহ্যের আধুনিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষ্য গড়ে উঠতে লাগল বিশ শতকে, শান্তিনিকেতনের ডাঙার প্রান্তে, প্রকৃতির আমন্ত্রণে। রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সম্মিলিত শিল্প-সংস্কৃতির আদর্শে এই তিন শিল্পী-স্থপতি চোখ ও মনের দৃষ্টিদীক্ষা লাভ করেন। শান্তিনিকেতন নির্মাণ আদর্শে জোড়াসাঁকো

ঠাকুর বাড়ির ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক ও সচলায়িত। অধিক রূপে বলা যায়—জোড়াসাঁকোই শান্তিনিকেতন পরিবেশ স্থাপত্যর নির্মাতা। প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে।

এই লেখায় সর্বমান্য ত্রয়ীর মধ্য থেকে সুরেন্দ্রনাথ কর-কে নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে।

সুরেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৯২ সালে, মুঙ্গের জেলার হাভেলি খড়গপুরে। মামাতো ভাই নন্দলাল বসু—তাঁর 'নতুনদা'। নতুনদা-ই সুরেন কর-কে জোড়াসাঁকোয় অবনীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যান—১৯১১ সালে। নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার ও মুকুল দে সতীর্থ ছিলেন। গড়ে উঠতে লাগল নবশিল্প চেতনা। ১৯১২/১৯১৩ সালে অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণায় অজন্তার অলংকরণ ও বিভিন্ন মুদ্রার প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন সুরেন্দ্রনাথ। প্রদর্শিত হয় ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি-তে। ১৯১৪/১৯১৫ সালে জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণায় 'বিচিত্রা ক্লাব' পত্তন হল। রথীন্দ্রনাথ ছিলেন সংযোগকারী। বহুগুণী সমাবেশে ধীরে ধীরে বিচিত্রা ক্লাব ঘিরে সমন্বয়ী শিল্প আন্দোলন জেগে উঠতে লাগল।

১৯১৪ সালে জগদীশচন্দ্র বসু, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের দেওয়াল চিত্র (Fresco) গড়ার জন্য নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ-কে আমন্ত্রণ জানান। অজন্তাশৈলীর অলঙ্করণ, নিসর্গ চিত্র মিলিয়ে কাজ করেছেন সুরেন্দ্রনাথ। নন্দলাল করলেন 'মহাভারত' থেকে। ড্রইং-এর কাজ চলত, জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রা বাড়ির হলে। ড্রইং-এর কাজ চলাকালীন, নন্দলাল (নতুনদা) দ্বারভাঙায় চলে যান, পিতার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে। সুরেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের উৎসাহে কাজ চালিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে (১৯১৭) দু'জনে মিলিত ভাবে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ফ্রেসকো সম্পূর্ণ করেন। কাছাকাছি সময়ে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের দল নিয়ে কলকাতায় 'ফাল্গুনী' অভিনয় করেন (১৯১৬)। বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের সাহায্যকল্পে। সুরেন্দ্রনাথ-এর কাছে যা ছিল চিরস্মরণীয় ঘটনা। এরপর ১৯১৬ সালেই রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে তিনি রবীন্দ্রনাথের সাথে শিলাইদহে যান। কিছুদিন কুঠি বাড়িতে থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পদ্মাবোটে পদ্মায় থাকতে গেলেন। সুরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ও সৃষ্টিতে নদী, প্রকৃতি ও গ্রামের মানুষ স্থায়ী রূপ নিতে থাকল। সাথে ছিল কবির সঙ্গ ও আলাপচারিতা। শিল্পী-জীবনে যেন নতুন পথের সন্ধান মিলল।

এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ জানান শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিতে। বলেছিলেন ওখানে এমন খোলা আকাশ, অবারিত মাঠ, খোয়াই, আশেপাশে প্রতিবেশী সাঁওতালদের শান্তিনিকেতনে পাবে। ১৯১৭ সালে সুরেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে যোগ দেন। সুরেন্দ্রনাথের শিল্প ও শিল্পী জীবনের যেন মাইল ফলক প্রতিষ্ঠিত হল; যার সৃষ্টিশীলতা হয়ে উঠবে সুদূরপ্রসারী। অর্থময়। পরের বছর ১৯১৮ সালে বিশ্বভারতীর পত্তন হয়। এই সময়েই রথীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতনে যোগ দিলেন। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী (শিল্পী-দম্পতি) শান্তিনিকেতনে 'বিচিত্রা কারু সংঘ'-এর কাজ গড়ে তোলেন। জোড়াসাঁকো থেকে 'বিচিত্রা' এল শান্তিনিকেতনে। কারু ও চারু শিল্পের সম্মিলনী সৃষ্টি হল। কাছের গ্রামের শিল্পীরাও যোগ দিলেন। সুরেন কর ও পরবর্তী সময়ে নন্দলাল—এঁদের অবদান ছিল প্রত্যক্ষ। শান্তিনিকেতনেই সার্বিকভাবে কলাভবন ও কারু সংঘ একত্রিত উদ্যমে শিল্প ও প্রয়োগ শিল্প আন্দোলনের গতিপথ তৈরি করে, স্বাধীন চিন্তা ও প্রয়োগশৈলীতে। যদিও দেশ তখন রাজনৈতিক দিক থেকে পরাধীন!

১৯১৮ সাল থেকে সুরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ও ডিজাইনে শান্তিনিকেতনে সুলভ গৃহ স্থাপত্য গড়ে উঠতে থাকে। আশ্রমের অর্থসংকট মানিয়ে নিয়ে কম খরচায় কিন্তু সৌন্দর্যে-ভরপুর স্থাপত্যশৈলী দেখা দিতে লাগল। শমীন্দ্রকুটির, সত্যকুটির, সন্তোষালয়, কোনার্ক প্রভৃতি স্থাপত্য সৃষ্টি হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের সহজ, সরল, সুন্দর ও টেঁকসই—এই আদর্শ নিয়ে শান্তিনিকেতন-নির্মিত পরিবেশ সংস্কৃতি গড়ে উঠতে থাকল। একদিকে যেমন ভারত শিল্প ঐতিহ্যের সময়োপযোগী প্রকাশ রূপ পেতে থাকে, একই ছন্দে চারপাশের পরিবেশকে মানিয়ে নিয়ে নির্মিত

হতে থাকে পরিবেশভিত্তিক স্থাপত্য ও নির্মিত পরিসর। শৈল্পিক গভীরতায় রবীন্দ্রনাথের শিল্প দর্শন—আধুনিক ভারতে (বিশেষত বিশশতক) এক নতুন শিল্প-স্থাপত্য ভাষ্যে প্রকাশিত হতে থাকে বিশ্বভারতী—শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে।

শিক্ষা প্রাঙ্গণে, উন্মুক্ত ক্লাসঘর নাটমঞ্চ, ভাস্কর্য, দেওয়াল শিল্প, লোকশিল্পের প্রয়োগ, কাছের আদিবাসী শিল্প স্থাপত্যের সংযোগে নির্মিত হয়ে চলে শিল্প ও স্থাপত্য সমন্বয়ী ভাষা। কাছের গ্রামের শৈলী, নির্মাণ উপাদান ও আশ্রমের প্রাণকেন্দ্র—কলাভবন ও শিল্পসদনের ঐক্যছন্দে শান্তিনিকেতন নির্মিত পরিবেশ সৃষ্টি হয়—স্থানীয় পরিবেশ, ভূমি ও মানুষের ছন্দের সমন্বয়ে। এই কাজে রবীন্দ্র আদর্শে মুখ্য স্থপতি রূপে কাজ করেছেন সুরেন কর। আশ্চর্য উদ্ভাবনী শক্তিতে এক চিত্রীকে সার্থক রূপে গড়ে তোলেন—রবীন্দ্রনাথ। তিনিই সুরেন করের মধ্যে এই সমন্বয়ী প্রতিভা আবিষ্কার করেন। উদ্বুদ্ধ করেন আধুনিক ভারতে গৃহবাণীময় (ecologic) শিল্প-স্থাপত্যের অভিনবত্ব প্রকাশে। পরপরই বেশ কয়েক নির্মিত আদর্শের প্রসঙ্গ করা যেতে পারে—উত্তরায়ণে বাগান ও নির্মিত পরিসর—উদয়ন, কোনার্ক, মালঞ্চ, শ্যামলী, উদীচী, কলাভবন, সঙ্গীতভবন, শ্রীনিকেতনের বাড়ি, পাঠভবন, মৃন্ময়ী, কালোবাড়ি, চৈতী, চিত্রভানু, নাট্যঘর, হস্টেল বাড়ি, শ্রীসদন—এমন অনেক আদর্শ। যা আজও আধুনিক ভারত শিল্প স্থাপত্যের সচলায়িত আদর্শ। একই ছন্দে গড়ে উঠতে থাকে মাননসই উন্মুক্ত ভাস্কর্য, তালধ্বজ কুটির, পাঠভবন, কলাভবন, হলকর্ষণ বেদী, হিন্দি ভবন ও চিনা ভবনের অন্দর ও বাহির দেওয়াল চিত্র (ফ্রেসকো) স্টুকো ও রিলিফ ভাস্কর্য। সুরেন কর, নন্দলাল, রথীন্দ্রনাথ, রামকিঙ্কর, তেজেসচন্দ্র সেন, বিনোদবিহারী, প্রভাস সেন, প্রতিমা দেবী—নানান গুণীরা একত্রিত হয়ে এই সৃষ্টি কাজের সচলায়িত রূপ গড়ে তোলেন, রবীন্দ্র আদর্শে প্রাণিত হয়ে। সাথে ছিল শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের প্রকৃতি ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় নির্মিত রূপ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রয়োগ শিল্পীদের সমন্বয়ী প্রকাশ গড়ে ওঠে—যা ছিল ঐতিহাসিক। আজও গ্রহণযোগ্য। এই কাজে কয়েকজনের নাম বলা যায়, কিনতারা, কামাহারা, প্যাট্রিক গেডেস, আর্থার গেডেস, আন্দ্রেঁ কার্পেলয়, কোনোসান, এলস্‌হার্স্ট, এন্ড্রুজ আরও অনেক গুণীরা। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয়ী প্রয়োগশিল্প এগিয়ে চলেছিল। সামগ্রিক প্রয়োগ শিল্পের অভিজ্ঞতা শান্তিনিকেতনের বাইরেও কাজে লাগে। অনেকেই এই কাজে সফল হয়েছেন। রামকিঙ্কর, নন্দলাল, রথীন্দ্রনাথ, বিনোদবিহারী অবশ্যই, সুরেন কর।

এই প্রসঙ্গে সুরেন করের শান্তিনিকেতনের বাইরে শান্তিনিকেতন কারুশিল্প, স্থাপত্য-পরিবেশ আদর্শ—সঞ্চারিত কাজের কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথ চাইতেন এখানকার পরীক্ষালব্ধ সত্য দেশের প্রান্তে প্রান্তে স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে নিয়ে স্বাধীন চিন্তায় বিস্তারিত হোক।

আজ দেশে বিদেশে শান্তিনিকেতন ঘরানার বাতিক শিল্প বিস্তৃত। ১৯২৭ সালে জাভা-বালি যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ সুরেন করকেও সঙ্গে নিয়ে যান। এখানেই তিনি ইন্দোনেশীয় বাতিক শেখেন। প্রতিমা দেবীর সহায়তায় কলাভববেন বাতিক শিক্ষা প্রবর্তন করেন। নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরী ভঞ্জর সহায়তায় তুলি নির্ভর বাতিক চিত্রকলায় প্রবর্তিত করেন। ইন্দোনেশীয় যন্ত্রনির্ভর বাতিককে শান্তিনিকেতন শিল্প-ঘরানার তুলি নির্ভর বাতিকে পরিণত করেন।

এদেশের নূতন চিত্রকলার একটি প্রদর্শনী জার্মানীতে যায়। সুরেন্দ্রনাথের ছবিও স্থান পায়। ১৯২০ থেকে প্রায় ১৯৬০ সাল পর্যন্ত সুরেন করের অন্দর ও বাহির স্থাপত্য-পরিবেশ নির্মাণের কিছু প্রসঙ্গ করা যায়। মাদ্রাজ আডিয়ারে থিয়োসফিকাল স্কুল, বারাণসী রাজঘাটে মন্টেসরি স্কুল; কলকাতায় মহাজাতি সদনের আখ্যানভাগ; কেওড়াতলায় দেশবন্ধু স্মৃতিসৌধ; মাদ্রাজের কলাক্ষেত্র ভবন; আহমেদাবাদে অম্বালাল সারাভাই পরিবারের গৃহপুঞ্জ; বোকারো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নগর পরিকল্পনা, রেলস্টেশন, হাসপাতাল; আহমেদাবাদ ফাইন আর্টস কলেজের পরিকল্পনা; দিল্লীতে রাজঘাটে গান্ধির সমাধি পরিকল্পনা; জোড়াসাঁকোয় রথীন্দ্রমঞ্চ পরিকল্পনা; দুর্গাপুরে গির্জার স্থাপত্য ডিজাইন; শান্তিনিকেতনে

রবীন্দ্রশতবর্ষে বিচিত্রাভবন; দিল্লীতে রাষ্ট্রপতিভবনে অন্দরসজ্জা; দুর্গাপুরে অতিথিভবন—অন্দরসজ্জা আরও কিছু—১৯৫০ দশকে শিল্প স্থাপত্য-ভিত্তিচিত্রের অভিনব কাজ রয়েছে ডিভিসি-বোকারো বিদ্যুৎ কেন্দ্রে। পাওয়ার হাউসে প্রায় ২১৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও আট ফুট উচ্চতার রঙিন পাথর দিয়ে ভিত্তিচিত্র ও কারখানার আখ্যানভাগের পাথুরে (রঙিন জয়পুরী পাথর ও জয়পুরের শিল্পী সমন্বয়ে) ভিত্তিচিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় লোকজীবন, প্রকৃতির মোটিফ, আলপনা শৈলী— নিয়ে ভিত্তিচিত্রের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। যন্ত্রনির্ভর কারখানার নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যথার্থ দৃশ্যশিল্প।

সুরেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির ভিত্তিচিত্র শিল্পের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। অবনীন্দ্রনাথ জয়পুর থেকে শিল্পীদের আনিয়ে যৌথ স্থাপত্যিক দৃশ্য শিল্প গড়ে তোলেন। সেই পরম্পরায় নন্দলালের উদ্যোগে শান্তিনিকেতনেও জয়পুর ঘরানার শিল্পীরা যোগ দিয়েছিল। সুরেন কর এই অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ছিলেন। বোকারোর কাজে প্রয়োগ করেছেন।

শান্তিনিকেতনে মূলত রথীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে উত্তরায়ণ-এর গৃহে যেমন উদয়ন, চিত্রভানু, কোনার্ক, রতনকুঠিতে প্রাচ্য শৈলীর আসবাব ও অন্দর সজ্জার সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এই কাজে জাপানি দারু শিল্পীরা—কাসাহারা ও কোনোসান যোগদান করেন। যদিও এই ধরনের অন্দরসজ্জা প্রথম করেন অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ—বিচিত্রা বাড়িতে। কাসাহারা প্রথমে জোড়াসাঁকোয় অবনীন্দ্রনাথের পরিচালনায় দারুশিল্পের কাজ করেন।

এই ভাবধারায় সমৃদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ পরবর্তী পর্যায়ে দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবন ও আহমেদাবাদে সারাভাইদের অন্দর গৃহসজ্জায় প্রয়োগ করেন।

আরও এক শিল্প শৈলীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও সুরেন্দ্রনাথকে সাথে নিয়ে পেরুর উদ্দেশে প্রথমে প্যারিস গেলেন। প্রতিমা দেবী মৃৎপাত্র কলা শেখার জন্য প্যারিসে থেকে গেলেন। রথীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ লন্ডনে গেলেন। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ পাথরছাপ পদ্ধতি শেখার জন্য কাউন্টি কাউন্সিল স্কুলে ভর্তি হলেন। পাথরছাপ ছবি আয়ত্ত করেন। ফিরে এসে শান্তিনিকেতন কলাভবনে পাথর-ফলকছাপ বা লিথোগ্রাফি শেখানো শুরু করেন। বিচিত্রাসভায় জোড়াসাঁকোয় গগনেন্দ্রনাথ ছবি ছাপার জন্য লিথোপ্রেস কিনেছিলেন ও বহু ছবি প্রস্তুত হয়েছিল। সুরেন করের সেই অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি পরে প্রেসটি কলাভবনে আনেন। লিথোগ্রাফি শান্তিনিকেতনে প্রবর্তিত হয়। লন্ডনে থাকাকালীন বই বাঁধাই (সফ্‌ট বই বাইন্ডিং) পদ্ধতি আয়ত্ত করেন। পরে কলাভবনে এই শিল্প প্রবর্তন করেন সুরেন্দ্রনাথ। সেখান থেকে যন্ত্রপাতিও সঙ্গে করে এনেছিলেন। বীরভদ্র রাও চিত্র ও শোকলা সাঁওতাল তাঁর কাছে এই কাজ শেখেন। শোকলা সাঁওতাল এই কাজ শিখে বিশ্বভারতীতে দফতরি হয়ে ওঠেন। পরে এই বিশেষ শৈলী দেশের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

রথীন্দ্রনাথ ১৯২৮ সালে লন্ডনে অসুস্থ অবস্থায় কিছুদিন থাকেন। সেই সময়ে তিনি চামড়ার কাজ, চামড়াশিল্প আয়ত্ত করেন। ফেরার পথে যন্ত্রপাতি এনে শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে চামড়াশিল্প শেখান। সেই থেকেই বিখ্যাত শান্তিনিকেতন ঘরানার লেদার ক্রাফ্‌ট ও ডিজাইন বস্তু সামগ্রী প্রচলিত হয়। সেই ধারা আজও ভারতের দিকে দিকে আছে। প্রতিমা দেবীর পট্যারি শিল্প শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন থেকে দেশের নানা প্রান্তে বিস্তৃত হয়।

এইভাবেই শান্তিনিকেতনে শিল্পী ও শিক্ষকেরা রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে, সর্বতোমুখী প্রয়োগ শিল্প সংস্কৃতি আন্দোলন জাগিয়ে তোলেন। গ্রামেগঞ্জে অনেক মানুষের জীবিকা গড়ে ওঠে। দেশের প্রান্তে প্রান্তে সুপ্ত শিল্প প্রতিভা আবার নব উদ্যমে জেগে ওঠে।

জোড়াসাঁকো থেকে শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন; সেখান থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সমন্বয়ী প্রয়োগশিল্পের উদ্যোগ ছড়িয়ে পড়ে। রবীন্দ্র আদর্শে। সুরেন্দ্রনাথের মতন গুণীরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

সুরেন কর ছবিতে (চিত্রশিল্প) ওয়াসের স্বচ্ছতা ও গুয়াস, টেম্পারার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। নিজস্ব

আঙ্গিকে প্রয়োজন মতন। কাছের গ্রামের সাঁওতাল লোকজীবন ও নিসর্গ তাঁর ছবিতে স্থান পেয়েছে। 'পথের সাথি' ছবির বিষয় ছিল তরুণ ও সঙ্গী তরুণী-সাঁওতাল, বাঁশি বাজিয়ে এগিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের পছন্দ অনুসারে এই বড় অনবদ্য ছবিটি জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাসভায় টাঙানো থাকত। নানা কাজের ব্যস্ততা সত্ত্বেও আজীবন ছবি এঁকেছেন; বাড়ি ঘর দোরের নকসা প্রস্তুত করেছেন। এগিয়ে গেছেন, সৃষ্টিশীলতার অনুবর্তনে। সেদিনের শান্তিনিকেতন সমাজে সুরেন্দ্রনাথ অপরিহার্য আদর্শ রেখে গেছেন। তাঁর স্বল্পায়ু স্ত্রী 'রমা দেবী' ছিলেন আশ্রমের অপরিহার্য রবীন্দ্রসংগীত গায়িকা ও শিক্ষক। রবীন্দ্রনাথের স্নেহের 'নুটু'।

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের (১৯৪১) পর সেই কঠিন সময়ে রথীন্দ্রনাথ ও সুরেন কর বিশ্বভারতীর হাল ধরেছেন। নানা ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করেও বিশ্বভারতীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। আজ বিশ্বের নানা দিকে সর্বসমন্বয়ী ডিজাইন ইনস্টিটিউটের ভূমিকা অপরিহার্য। দুন শিল্প গড়ে তুলতে কাছের লোকালয়ের মানুষ ও তাদের শৈলীকে সম্মান জানিয়ে—ডিজাইন এগিয়ে চলেছে। যা অভিপ্রেত! শান্তিনিকেতন–শ্রীনিকেতন রবীন্দ্র আদর্শে প্রায় একশ বছর আগেই এই পথ প্রস্তুত করেছিল। নন্দলাল, রথীন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ—এই বিরল (আজও) ত্রয়ী শিল্পীর অবদান চিরস্থায়ী। এই আদর্শকে মানুষ-ভূমি ও পরিবেশ সমন্বয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই—বিশেষ প্রয়োজনীয়।

নন্দলাল ১৯৫১ সালে কলাভবনের পরিচালক-অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর নিলে; ১৯৫১-১৯৫৫ অবধি সুরেন্দ্রনাথ কলাভবনের অধ্যক্ষ-এর দায়িত্ব নেন। ১৯১৭ থেকে ১৯৫৫ সুদীর্ঘ সময়ে তিনি কলাকেন্দ্রে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৩৫-১৯৪৭ পর্যন্ত বিশ্বভারতীর সচিব পদের দায়িত্ব সামলেছেন—সফলতার সঙ্গে।

জীবনের শেষ পর্বে তিনি ছেলেদের কাছে দুর্গাপুরে থেকেছেন। সেখানেই ২ আগস্ট, ১৯৭০ সালে তিনি প্রয়াত হন। রবীন্দ্র আদর্শে রূপকলার প্রাণনিকেতন—-জীবননীড়-এর অন্যতম সার্থক রূপকার সুরেন্দ্রনাথ কর। তাঁর রেখে যাওয়া আকারায়িত আদর্শ—আমাদের জীবনের শিল্পপথে চলার সম্পদ।

Raja Rajendralal Mitra Memorial Lecture

The Asiatic Society, Kolkata has organized Raja Rajendralal Mitra Memorial Lecture, 2021 on 10th March 2023 at 5 p.m. through online mode. Professor Gaya Charan Tripathi, Former Director, B. L. Institute of Indology was invited to deliver the Raja Rajendralal Mitra Memorial Lecture. Dr. Asok Kanti Sanyal, General Secretary (Acting) gave the Welcome Address. Professor Nabanarayan Bandyopadhyay gave the introductory speech. Honorable President Professor Swapan Kumar Pramanick delivered the Presidential Address. Then Professor Tripathi gave his valuable lecture on "Traces of Buddhist Thoughts in the Bhagavad Gita". Dr. Sujit Kumar Das, Treasurer gave the Vote of Thanks to wrap up the programme.

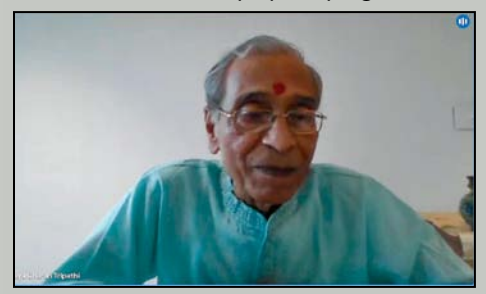

Professor Gaya Charan Tripathi delivering the Lecture.

L to R: Dr. Asok Kanti Sanyal and Professor Swapan Kumar Pramanick

Deltaic Women of Bengal Reimagining the Forest Rights Act, 2006 (India)

Amrita DasGupta
PhD Candidate, School of Oriental and African Studies, University of London

Sundarbans, the world's only mangrove tiger land is shared between India and Bangladesh with the India-Bangladesh (then East Pakistan) international border running across it after the 1947 Partition. The mangroves are Kolkata's first line of environmental defence and is susceptible to repeated cyclonic catastrophes. The deltaic islands of the Sundarbans are formed by the confluence of the Ganges, Brahmaputra, and the Meghna rivers. This archipelago of 102 islands, shelters the rare species of man-eating big cats named the Royal Bengal Tiger. Humans and animals live in close proximity here, such that, human-tiger conflict is a quotidian occurrence: the official statistics chronicles 21 deaths by tiger attacks in 2020 alone – the year of the super cyclone, Amphan.[1] The conflict escalates after every such cyclone. Such cataclysms dissolve the land water divide in the Sundarbans making the forest one with the villages. However, a large proportion of tiger attack deaths remain unreported. The Bangladesh side of Sundarbans is devoid of permanent human settlements, whereas Indian Sundarbans

battle the age-old problem of permanent human settlements in the buffer zone. Thus, the necessity for people-centric laws safeguarding the rights of forest dwellers become indispensable on the Indian side of the mangrove tiger land. In the absence of people inclusive Acts in the Indian Sundarbans and inability to purchase the costly permits to enter the forest, most islanders of the Sundarbans penetrate the forest illegally in hope of garnering forest produces for survival. To avoid being marked and harassed by the forest guards, the families of the victims who enter the forest illegally refrain from reporting any mishaps. The women who lose their husbands to tiger attack are ostracized by the deltaic community. They are believed to be ill omen and are slurred as the "swami khejos" (husband eaters). In many instances, the tiger attack widow ("bagh bidhoba" in Bengali) is prevented from undertaking the traditional occupations of the islands—agriculture, fishing, crab collection. Tiger attack death resulting after illegal entry into the forest, disqualifies the family of the deceased from availing financial compensation from the Forest Department. Consequently, the widows face the immediate blow. The lack of viable alternatives to start anew force the widows to migrate to the city of Kolkata to take up any opportunity for income—construction labour, house maid, sex worker. Amongst all, sex work is the easiest. In 2009 after the devastation of cyclone Aila, the red-light area of Kolkata (Sonagachi) recorded a 20-25% increase in the number of sex workers from the delta.[2]

Is the Forest Rights Act, 2006 (India) a Postcolonial People-Centric Act?

In the face of historical injustice experienced by the forest dwellers of India since the colonial period and well after independence in 1947, the Forest Rights Act, 2006 also called the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 appeared promising. It recognized the rights of the forest dwellers to forest resources thereby ensuring the livelihood and food security of the forest dependent communities. The only caveat is that access to the forest resources must be achieved sustainably without causing harm to the biodiversity and ecological balance. Nonetheless, just like the previous forest laws, FRA 2006 too failed to uphold a people-centric approach.

The Indian Forest Act(s) of 1865, 1878 and 1927 classified forested regions into three categories: reserved forests (complete government control), protected forests (partial government control), and village forests (under management of local village community). The Acts primarily served to establish and secure the colonial government's monopoly over the best forests and their produce. Under the provisions provided by these Acts, the colonial government could declare any land with foliage cover as a government forest without resettling and rehabilitating the traditional communities residing there. The government had the power to truncate the right of forest dwellers from accessing the forest and could penalize them for entering these spaces for conventional use without permission. The Acts allowed the imperial government to levy duties on timber and declare teak as government property.

When contextualizing the contemporary situation of the forest communities in the Sundarbans Reserve, the Wildlife Protection Act,1972 and the tiger conservation programme titled the Project Tiger,1973 becomes important. Wildlife Protection Act, 1972 aimed to conserve wildlife in their natural habitat by closing off the core areas of the forest to human interaction, to prevent extinction of endangered species through poaching and killing of animals. The Project Tiger, 1973 continues to preserve Bengal Tigers in their habitats where these habitats are ecosystems of natural heritage and biological significance. Its main purpose

is to protect the tigers from extinction by visualizing the tiger reserves as safe breeding grounds for the tigers devoid of human interference. In both instances, the traditional forest dwellers are denied entry to certain pockets of the forest. Centring bureaucratic concerns on the dwindling tiger population and disregarding the distress of traditional forest dwellers, Sundarbans was declared a biosphere reserve in 1989. Hence, the bureaucratic layers of the Wildlife Protection Act, 1972 and Project Tiger, 1973 functioning in the Sundarbans removes the traditional communities in manifold ways from foraging forest materials for mortal existence. Therefore, forcing the islanders to look for livable substitutes elsewhere.

In the light of which FRA 2006 with its basic promise to restore the right to the forest produce to the forest communities came as a relief. It meant that Sundarbans communities would not need costly permits to enter the forest. According to the FRA 2006, after the implementation of the Act in the area the community would become legal visitors and guardians of the forest and could claim compensations for animal attack deaths on people who entered the forest. The act would apparently legalize the community's claim to the forest and its resources and therefore, appeared people-centric in approach at a first glance. Nevertheless, citing sections from the FRA 2006 itself, the West Bengal Forest Department declined the implementation of the Act in the Sundarbans and exposed its people-exclusive features proving the Act to reflect the colonial forest laws.

Causes of Non-Implementation of FRA 2006 in Indian Sundarbans

Sundarbans is identified as a "critical wildlife habitat." To Safeguard this fragile ecosystem from further irreversible damage and complete disappearance it is necessary to keep the forests and its ecosystem inviolate. The Scheduled tribes and traditional dwellers under the FRA 2006 are allowed to collect "minor forest produce" like non-timber forest produce (bamboo, brush wood, stumps, cane, tussar, cocoons, honey, wax). Sundarbans dwellers go beyond the prescribed laws and to make financial profit they collect, sell near extinct species of crabs. For instance, the tree climbing crab– *Episesarma mederi*. The settlers of Sundarbans if not Scheduled Tribes, fail to fit the category of "other traditional forest dwellers" who are given exclusive rights to the forest. FRA 2006 describes "other traditional forest dwellers" as those who have lived in the area for three generations prior to 13 December 2005. "Generation" is defined as a span of 25 years. Therefore, three generations comprise of a span of 75 years. Only 4.78%[3] of the present residents of Indian Sundarbans are Scheduled Tribes while the remaining percentage of the population settled in the area mostly after the 1971 Liberation War which counts for 51 years of residence. Thereby, deeming most of the islanders ineligible to enjoy the primary benefits of FRA 2006. The implementation of the Act would create a conflict between the eligible Scheduled Tribes, the traditional forest dwellers and the ineligible forest dwellers, as the latter category of islanders are in majority. Nonetheless, there is a tiny window for those who fail to claim resettlement and alternate packages by fitting the category of Scheduled Tribes and "other traditional forest dwellers." The Chapter III, 4 (3) of FRA 2006 vaguely claims to provide resettlement to those who have dwelled in the forested land before 13 December 2005. The West Bengal Forest Department plays on the vague legal language and traces the FRA 2006 provisions back to the initial requirement spelled in Chapter I, 2 (O) of living through three generations in the area by 13 December 2005 to be able to claim the resettlement and alternate packages rights.[4] Even so, the Forest Department of West Bengal has alternate schemes like providing Liquid Petroleum Gas (LPG) free of cost to reduce wood collection through tree felling in the forest,

recruiting local students as remunerated tourist guides to spread ecological awareness about Sundarbans among the tourists. The recruitment scheme of youngsters as tour guides helps to prevent them and their families from venturing into the forests. The settlements in the Sundarbans are not "forest villages" (state government established settlements inside forests and taungya settlements[5] in any forested areas of India). The settlements in Sundarbans are in the fringes of the forest. Being "forest villages" could assure the settlers rehabilitation in case of conservation related displacements.

Invisibilised Women Forming Solutions

After the death of the male breadwinner to tiger attack, the widow is left alone to fight the ostracizations of the society and must shoulder the responsibility of her grieving family. It is a common practice that the in-laws push the tiger attack widow out of the house and keep back her children. With or without the responsibility of raising children, the widowed woman has little to no access to government support.[6] Consequently, she is forced to take up any available job in the city of Kolkata that will sustain her. Being unlettered and unskilled the easiest job prospect for the migrating deltaic woman is sex work. During a personal research activity in the Autumn of 2020 conducted by the author, the respondents (tiger widows) from Dulki Village, Sundarbans brainstormed myriad solutions within the semi structured interview setting on how FRA 2006 can be made people inclusive. It goes without saying that to create people-centric acts, the government needs to pay attention to the knowledge of the locals. Rather the most marginalized amongst all in the suffering community must be given priority. In this case, the deltaic (widowed) women emerge as the principal category.

The Solutions

Some of the most outstanding suggestions given by the deltaic women who are tiger widows for a people-centric Forest Act are outlined here. They said, the Act should be more attentive to the unique human settlement, geographical history of the individual forested regions. In considering the needs of the ecosystem alone the FRA 2006 falls short in proposing solutions for places with varied settlement history like Sundarbans. The Sundarbans houses many migratory community who entirely depend on forest produce. They had migrated here propelled by the land reclamation scheme of the British colonial state and here had found an occupational geolocation compatible to their riverine skills. FRA 2006 is not accurate in mentioning the probable resettlement areas and rehabilitation work schemes. In so doing, FRA turns a blind eye to the importance of environment that the forest dwellers can adapt to: if rural or riverine people without the required skills are forced to start living in urban landscapes or arid regions, it can result in the loss of livelihood for many. Some have underlined, the non-implementation of the FRA 2006 jeopardizes the survival methods of the Sundarbans dwellers. To help them survive without going to the forest the government should care to give them training in various spheres so that they can take up jobs elsewhere. Local job creation by means of NGOisation becomes imperative. This shall also prevent distressed women from falling into the nexus of human trafficking. Most have asserted that the income generated from the alternate job prospects should be equal to or more than what they earn daily by selling forest produce. They have also advised that access to forest produce should be made seasonal and not throughout the year. For instance, during the breeding season of fish and crabs, fishing and crab collection should be strictly prohibited. This shall help maintain the ecological balance without forcing endangered species to extinction. Though such rules are in place, such rules are commonly ignored owing to the thriving corruption at the official level.

Envisioning a Non-Migratory Future

Local ethnography in the villages of Sundarbans integrally dependent on forest produce or situated not far from the forest exposes a lack of unity amongst the various categories of inhabitants of the Sundarbans. Those who are forest dependent are dissatisfied by the non-implementation of the FRA 2006. On the contrary, those who are agriculture dependent or have prawn collection or crab collection businesses hardly care about their access to the forest for a living. There is also a disparity of demands witnessed between the well-to-do strata and the poor strata in this area. Those with money and power can bend the bureaucratic restrictions for their own benefit. This feeds the chain of corruption and profits the politicians, rich business class, corrupt forest officials equally. Undertaking a consignment to deliver Sundarbans crabs to the city first needs permission from the Forest Department for collection of the crustaceans. Given the threat of extinction faced by the species of crab found in the mangroves, the Forest Department should deny permission. However, the business class bribes the local politicians and corrupt officials of the Forest Department to fetch the required permissions and keep their businesses running. The propinquity of the international India-Bangladesh border in Sundarbans multiplies the potential of corruption: gold smuggling, cattle smuggling, transnational-trafficking-in-humans and organs. Such motivations to earn easy money continues to divide the Sundarbans community and benefits the policy/law makers who continue to make legislations imitative of people-exclusive colonial laws. To cease the continued culture of forced migration in the Sundarbans owing to the paucity of survival alternatives and restrictions on using the forest produce, the Sundarbans community must come together as stakeholders keeping aside their individual reservations, and demand for the creation and implementation of a people-centric forest act.

Endnotes

1 Alzazeera (2021) "Pushed Deep into Sundarbans these Indians Brave Tigers and Storms" https://www.aljazeera.com/news/2021/1/14/pushed-deep-into-sundarbans-these-indians-brave-tigers-storms

2 Verchot, Basu, Plucinska (2016) "Between the Dark Seas and Living Hell", *The Huffington Post* https://earthjournalism.net/stories/between-the-dark-seas-and-living-hell

3 Department of Sundarbans Affair, Government of West Bengal (2020) *24 Parganas Block Profile* https://www.sundarbanaffairswb.in/home/page/minakhan

4 Ministry of Tribal Affairs, Government of India (2006) *Forest Rights Act, 2006: Acts, Rules and Guidelines* https://tribal.nic.in/FRA/data/FRARulesBook.pdf

5 A forest management system where land is cleared for cultivation of food crops in combination with a desirable timber species.

6 See Video https://vimeo.com/581291631/4627efe66b, https://osun.video

সুকুমার সেন : ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের বিস্মৃত স্থপতি

নিলয়কুমার সাহা
অধ্যাপক, বাণিজ্যবিভাগ, মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যালয়

ঠিক ১২৫ বছর আগে ১৮৯৮ সালের ২ জানুয়ারি অধুনা বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার সোনারঙ গ্রামের এক বৈদ্য-ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নেন সুকুমার সেন। পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য, গরিষ্ঠ বঙ্গবাসী আজও সুকুমার সেন বলতে ভাষাচার্য সুকুমার সেনকেই নির্দেশ করেন। স্বাধীনতার হীরকজয়ন্তী বর্ষেই ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে পা রেখেছেন বিস্মৃতপ্রায় এক ভারতীয় আই সি এস অফিসার যাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় সদ্য স্বাধীন দেশবাসী প্রকৃত অর্থেই প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকের মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়েছিলেন, যাঁর দৃপ্ত পদচারণায় স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম সাধারণ নির্বাচন সারা পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের রাজসূয় যজ্ঞের শিরোপা অর্জন করেছিল, তিনি শ্রী সুকুমার সেন, স্বাধীন দেশের প্রথম মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক।

স্বাধীনতার হীরকজয়ন্তীবর্ষে 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসব' উদ্‌যাপন আঙিনাতে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের বিগত আট দশকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেশের মানচিত্রে যে যুগান্তকারী ঘটনা প্রবাহের সন্ধান মেলে, গুরুত্বের নিরিখে সেই ঘটনাক্রম হল — এক : স্বাধীনতা প্রাপ্তি, দুই : স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন, এবং তিন : স্বাধীন দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। সন্দেহ নেই ঘটনা প্রবাহের এই তিনটি পর্যায় ভারতবর্ষকে 'জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন'এ উন্নীত করেছে। দীর্ঘ লড়াই-আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশের অর্জিত স্বাধীনতার পবিত্রতা রক্ষায় স্বাধীন দেশের সংবিধান প্রণয়ন এবং সংবিধান নির্দেশিত পদ্ধতি অবলম্বন — একুশ বছর বয়সোর্দ্ধ প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন দেশের প্রশাসকমণ্ডলী— করে 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী' ভারতবর্ষের আত্মপ্রকাশ রূপকথাকেও হার মানায়। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের মনোনীত সরকারের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং ড. বি আর আম্বেদকরের সুযোগ্য নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভের আড়াই বছরেরও কম সময়ে ভারতবাসী ঠিক যেমন প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনের স্বাদ অনুভবে সক্ষম হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর অদম্য প্রত্যাশা এবং শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের বিরামহীন প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা প্রাপ্তির পাঁচ বছরের মধ্যেই গণতান্ত্রিক উপায়ে গঠিত হয় স্বাধীন দেশের প্রথম মন্ত্রিসভা। মনোনীত সরকার অচিরেই রূপান্তরিত হয় নির্বাচিত সরকারে আর

সদ্য স্বাধীন একটি দেশ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের মর্যাদা লাভ করে। এই যাত্রা কতটা কঠিন ছিল, কীভাবে এই অসাধ্য সাধিত হয়েছিল ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা, পর্যালোচনা স্বাধীনতার হীরকজয়ন্তীবর্ষে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

ব্রিটিশ শাসনমুক্ত সদ্যজাত স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বাধীন তদারকি সরকার আন্তরিকভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ পরিচালনার লক্ষ্যে সংসদীয় পরিকাঠামো রচনায় উদ্যোগী হয়। এই উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী হলেও নাগরিকত্ব আইনের ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ নম্বর ধারা এবং সংবিধানের ৩২৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতীয় নির্বাচন আয়োগ-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ভারতীয় নির্বাচন আয়োগ-এর কার্যক্রম শুরু হয় ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী হওয়ার একদিন আগে অর্থাৎ ১৯৫০ সালের ২৫ জানুয়ারি। ১৯৫০ সালের ২১ মার্চ আই সি এস সুকুমার সেন ভারতবর্ষের প্রথম মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ওই সময় তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবের পদে কর্মরত ছিলেন। দায়িত্ব গ্রহণের এক বছর সাত মাসের মধ্যে শ্রী সেন দেশের ১৪টি জাতীয় এবং ৬৩টি প্রাদেশিক ও স্থানীয় রাজনৈতিক দলের মোট ১৭,২৩৫ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণের সাহায্যে একই সাথে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের প্রথম লোকসভা এবং বাইশটি প্রদেশের প্রাদেশিক বিধানসভা গঠনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সূচনাকল্পে যে কর্মযজ্ঞের সুচনা করেছিলেন তা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। ২১ বছর বয়সোর্দ্ধ ১৭৬ মিলিয়ান ভারতবাসীকে তিনি ভোটদানকারী হিসেবে সামিল করেছিলেন গণতন্ত্রের এই মহোৎসবে, যাঁদের শতকরা ৮৫ শতাংশ ছিলেন অক্ষরজ্ঞানহীন। সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরক্ষর ভোটদাতাদের দ্বারাই নির্বাচিত হয়েছিল স্বাধীন দেশের ৪৮৯ আসন বিশিষ্ট লোকসভা এবং ৩,২৮৩ আসন বিশিষ্ট বিভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক বিধানসভার জনপ্রতিনিধিগণ। এই জনপ্রতিনিধিদের হাত ধরেই জন্ম হয়েছিল স্বাধীন ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের। শ্রী সেন কিভাবে এত অল্প সময়ে সম্ভব করেছিলেন এই অসম্ভবকে তা আজ বিস্মৃত ইতিহাস।

জেলা জজ শ্রী অক্ষয়কুমার সেন এবং শ্রীমতী সুষমা সেনের আট ছেলে ও দুই মেয়ের তৃতীয় সন্তান সুকুমার সেন। সেন দম্পতির আর দুই কৃতি সন্তানের একজন হলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ডা: অমিয় কুমার সেন, যিনি কবিগুরুর শেষ জীবনে চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অপরজন হলেন স্বনামধন্য আইনজীবী শ্রী অশোককুমার সেন, যিনি পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র সুকুমার সেন বর্ধমান মিউনিসিপাল স্কুলে পড়াশুনার পাঠ শেষ করে কলকাতা প্রসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন এবং গণিতশাস্ত্রে প্রথম হয়ে স্নাতক হন। গণিতশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় সুকুমার সেন ১৯১৯ সালে ২১ বছর বয়সে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে গণিতশাস্ত্রে স্বর্ণপদক লাভ করেন। পারিবারিক সূত্রে জানা যায় ওই যাত্রা পথেই তাঁর পরিচয় হয়েছিল দেশমাতার আর এক কৃতি সন্তান শ্রী সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে এবং তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর ব্যক্তিত্বে গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আইনব্যবসার প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকলেও অসময়ে পিতার মৃত্যুর কারণে সুকুমার সেন পারিবারিক প্রয়োজনেই বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের কর্মজীবন। ১৯২১ সালে সুকুমার সেন সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন এবং ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তিনি নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা ও পাবনা জেলার সেরাগঞ্জের মহাকুমা শাসকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৮ সাল থেকে প্রায় দু-দশক অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত শ্রী সেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জেলা জজ ও সেশান জজের পদে আসীন ছিলেন। স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ শ্রী সুকুমার সেনকে রাজ্যের প্রথম মুখ্যসচিবের পদে

নিযুক্ত করেন এবং ওই পদে শ্রী সেন ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। সেই সময় রাজ্যের মুখ্যসচিবের পদই ছিল সর্বোচ্চ পদ যা একজন আই সি এস অফিসার অলংকৃত করতেন। পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের সুপারিশেই প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার শ্রী সেনকে ১৯৫০ সালের ২১ মার্চ দেশের প্রথম মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদে নিযুক্ত করেন। ১৯৫০ সালের ২১ মার্চ থেকে ১৯৫৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সুকুমার সেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন। ওই সময়ে তাঁর নেতৃত্বে ১৯৫২ এবং ১৯৫৭ সালে দেশের দু-দুটি সাধারণ নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। সারা বিশ্ব চরম বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছিল পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ গণতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা। শ্রী সুকুমার সেনের নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচন আয়োগের যথার্থ পরিচালনায় এবং দেশবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণে রচিত হয়েছিল ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের মহাকাব্যিক ইতিহাস। পণ্ডিত নেহেরুর ভাষায়, "আমরা ছোট মাপের মানুষ, কিন্তু যোগ দিয়েছি বিরাট এক কাজে। এই কাজটা বিরাট, তাই বিরাটত্বের কিছুটা ছোঁয়া আমাদের গায়েও এসে লাগে, সে কৃতিত্বের আঁচ আমরা পাই।"

শ্রী সুকুমার সেনের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন আয়োগ দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার লক্ষ্যে দেশের সংবিধান, ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে অনুসৃত নির্দেশিকা অনুসরণ করে নানান প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সারা দেশে নির্বাচন কেন্দ্রের বিন্যাস, পুনর্বিন্যাস, সংরক্ষিত আসন নির্দিষ্টকরণ, ক্রমবর্ধমান উদ্বাস্তু সমস্যা এবং সর্বোপরি ভোটার তালিকা প্রণয়নের মত অত্যন্ত দূরূহ কাজের পাশাপাশি ভোট পরিচালনার উপযুক্ত পরিকাঠামো নির্মাণ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটকর্মী নিয়োগ, নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ অবাধ ও স্বচ্ছ রাখতে যথার্থ প্রশাসনিক পরিমণ্ডল রচনা, অধিকাংশ নিরক্ষর ভোটদাতার ভোটগ্রহণ এবং সবশেষে ফল ঘোষণার কাজ যে দক্ষতা, দ্রুততা এবং দৃঢ়তার সাথে সম্পাদন করেছিলেন তা আজও চরম বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

শ্রী সেন দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি রাজনৈতিক দলের জন্য পৃথক পৃথক নির্বাচনী প্রতীক নির্দিষ্টকরণের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ক্ষেত্র নির্মাণ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন দেশের পঁচাশি শতাংশ অক্ষরজ্ঞানহীন ভোটারদের পক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বহু রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে থেকে কেবলমাত্র নামের ভিত্তিতে পছন্দের প্রার্থীকে বেছে নেওয়া অসম্ভব। সেই কারণেই তিনি প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার্য নানান উপকরণ যেমন জোড়া বলদ, কুঁড়ে ঘর, হাতি, কাস্তে হাতুড়ি, প্রদীপ, উদীয়মান সূর্য, মানুষের হাত, দণ্ডায়মান সিংহ ইত্যাদি নির্দিষ্ট করেছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক হিসেবে। শ্রী সেনের ওই উদ্ভাবনী ভাবনার সার্থক প্রয়োগের ফলশ্রুতিতে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন কারণে বাজেয়াপ্ত ভোটের পরিমাণ চার শতাংশেই সীমাবদ্ধ ছিল। উত্তর-আধুনিক ভারতবর্ষ আজও সুকুমার সেন সৃষ্ট পথেই ধাবমান। কেবল নির্বাচনী প্রতীকই নয়, ভোটবাক্স এবং ভোটপত্রের নক্সা শ্রী সেন নিজেই প্রস্তুত করেছিলেন। লোকসভা এবং বিধানসভার জন্য আলাদা রঙের ভোটবাক্স এবং ভোটপত্রের ব্যবহারের নির্দেশও তাঁরই মস্তিকপ্রসূত। ১৯৫৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সুকুমার সেন প্রকাশিত 'রিপোর্ট অন দ্য ফার্স্ট জেনারেল ইলেকশানস্ ইন ইন্ডিয়া ১৯৫১-৫২' থেকে জানা যায়, "ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার জন্য — টাইপ এবং ক্রমানুগ সাজানো - ১৬,৫০০ কর্মীকে চুক্তির ভিত্তিতে ছয় মাসের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। ৩,৮৪,২১৫ রিম কাগজের ব্যবহার হয়েছিল ভোটপত্র তৈরি করতে। ভোটদানের পর ভোটপত্র সংরক্ষণের জন্য ২ মিলিয়ন অর্থাৎ ২০ লক্ষ ভোটবাক্স তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়েছিল

৮,২০০ টন স্টিল এবং জাল ভোট রুখতে ব্যবহৃত হয়েছিল ৩,৮৯,৮১৬ ফাইল কালি।" শ্রী সেনের অনুরোধেই সমকালীন বিজ্ঞানীরা এমন কালি প্রস্তুত করেছিলেন যা দেহের কোন অংশে একবার লাগলে দীর্ঘ দিন তা উজ্জ্বল থাকবে। এই প্রসঙ্গে আর এক মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী টি এন শেষণের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় কারণ সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষায় তিনি সচিত্র ভোটারপত্রের প্রবর্তন করেন।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী সুকুমার সেনের প্রশাসনিক দূরদৃষ্টিতার পরিচয় মেলে কৃত্রিম ভোটপ্রক্রিয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনভিজ্ঞ আধিকারিক এবং ভোটকর্মীদের ভোট পরিচালনায় দক্ষ করে তোলার অভিনব এক প্রয়াসে। এই লক্ষ্যেই তিনি দেশের প্রতিটি রাজ্যে কৃত্রিম ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা করেন এবং নিজে প্রতিটি রাজ্যে অনুষ্ঠিত ন্যূনতম একটি মহড়াতে উপস্থিত হয়ে নির্বাচনবিধি যথাযথ অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করেন। ১৯৫১ সালের ৫ আগস্ট রাজস্থানের উদয়পুরে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার কৃত্রিম মহড়া। ব্যক্তি-প্রচারবিমুখ সুকুমার সেন দেশের আপামর জনসাধারণকে নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সচেতন এবং আত্মনির্ভর করে তুলতে বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং এই কাজ যথাযথ সম্পাদনে শ্রী সেন বেতার, মুদ্রণ এবং চলচ্চিত্র ইত্যাদি মাধ্যমকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৫১ সালের ২৭ জুন দিল্লি অল ইন্ডিয়া রেডিও ভোটারদের উদ্দেশ্যে 'কিভাবে ভোট দিতে হবে', 'জাল ভোট রুখতে অক্ষয় কালির ব্যবহার' , 'ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যাতায়াত' ইত্যাদি বিষয়ে শ্রী সুকুমার সেনের নির্বাচন বিষয়ক সাতটি বক্তৃতা সম্প্রচার করে। সম্ভবত সুকুমার সেনের উদ্যোগেই ভারতবর্ষের তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের 'ফিল্ম ডিভিশান' ভোটারদের কাজ এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে 'রাইটস্ এন্ড রেসপনসিবিলিটিস্' এবং 'ডেমোক্রেসি ইন অ্যাকসান' শীর্ষক দুটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করে। এই তথ্যচিত্র দুটি সারা দেশে তিন হাজারেরও বেশি প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়েছিল।

নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে অবশেষে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে প্রথম সাধারণ নির্বাচন শুরু হয় ১৯৫১ সালের ২৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার এবং শেষ হয় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পটভূমিতে রাজনৈতিক দ্বৈরথ বর্তমান সময়ের মত কলুষিত না হলেও একেবার বিষমুক্ত ছিল না। তবে রাজনৈতিক হানাহানির বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও পৃথিবীর সর্ববৃহৎ 'গণতন্ত্রের জুয়াখেলায়' সুকুমার সেনের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় নির্বাচন কমিশন সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিল। ভারতবর্ষের প্রথম সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে সারা বিশ্ব যে উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছিল তা আজও দেশবাসীকে গর্বিত করে। ওয়াশিংটনে কর্মরত শ্রী এম. কৃপালনী, যিনি পরবর্তীকালে থাইল্যান্ডে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, সাংবাদমাধ্যমকে বলেন, "ভারতবর্ষের সাধারণ নির্বাচনের অগ্রগতি আমেরিকাবাসী অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁরা বিপুল সংখ্যক দেশবাসীর নির্বাচনে অংশগ্রহণে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তাঁরা ভারতবর্ষের অবাধ এবং প্রভাবমুক্ত নির্বাচন সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।" এই নির্বাচন সম্পর্কে ইংল্যান্ডের *ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান* পত্রিকায় (২২ জানুয়ারি, ১৯৫২) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লেখা হয়, "ভারতবর্ষের অধিকাংশ অংশে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচন অত্যন্ত পরিপক্ক, দক্ষ এবং সততার সাথে পরিচালিত হয়েছে। এই নির্বাচন যারা প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের উন্মুক্ত প্রশংসা পরিচালকমণ্ডলীর প্রাপ্য)"। 'এ্যাসোসিয়েট প্রেস অব অস্ট্রেলিয়া'র সভাপতি স্যার লয়েড দুমাস কলিকাতায় (৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২) ভারতবর্ষের সাধারণ নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেন, "সংবাদপত্রের মানুষ হিসেবে আমরা সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটদাতা দ্বারা পরিচালিত ভোট প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করছি। আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি এই নির্বাচন কার্যক্রম এতটা সফল হবে। সারা

বিশ্বের মানুষ ভারতবর্ষের এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত বিস্মিত এবং অভিভূত।" নির্বাচনে পরাজিত সমাজবাদী দলের প্রবাদপ্রতীম নেতা শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ ভারতবর্ষের নির্বাচনকে 'মুক্ত এবং অবাধ' আখ্যায়িত করে বলেন, "প্রজাতন্ত্রী ভারতবর্ষের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে দেশের ভোটদাতারা তাঁদের অসাধারণ গণতান্ত্রিক চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। ভারতবর্ষের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী সুকুমার সেন মহাশয়কে সাধারণ নির্বাচন প্রক্রিয়া অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ এবং সাংবিধানিক উপায়ে সম্পন্ন করবার জন্য জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।" সদ্য স্বাধীন একটি দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য সারা বিশ্ব যখন সুকুমার সেনকে অভিনন্দিত করছে সেই সময় আবেগ তাড়িত না হয়ে শ্রী সেন যেভাবে নিজের লক্ষ্যের কথা ব্যক্ত করেছিলেন তা আজও তাঁর প্রশাসনিক দায়বদ্ধতাকে উদ্ভাসিত করে। নির্বাচনের অন্তিম লগ্নে দেশ-বিদেশের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে শ্রী সেন বলেন, "নির্বাচন-পর্ব এখনও সমাপ্ত হয় নাই। উত্তর প্রদেশের পার্বত্য নির্বাচন কেন্দ্রসমূহে এখনও ভোটগ্রহণ বাকি আছে। তারপর আছে বিধান পরিষদ, রাষ্ট্রসভা এবং প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। আমরা এপ্রিল মাসের শেষে বা মে মাসের প্রথম ভাগে সমস্ত কাজ শেষ করিতে পারিব বলিয়া আশা করি।" অর্থাৎ ঠোঁট আর পেয়ালার দূরত্ব সম্পর্কে তিনি কতটা সচেতন ছিলেন তাঁর এই মন্তব্যেই তা প্রতিভাত হয়। অবশেষে সুকুমার সেন তাঁর লক্ষ্যে সফল হয়েছিলেন এবং যার ফলশ্রুতিতে ১৯৫২ সালের ১৩ মে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ২১ জন মন্ত্রীকে নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত হয় প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভা।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের সম্ভবত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজের মূল কারিগর শ্রী সুকুমার সেনকে ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান পদ্মভূষণ-এ ভূষিত করে। ১৯৬৩ সালের ১৩ মে কোলকাতায় বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে বিকাল ৩টের সময় শ্রী সেনের জীবনাবসান হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট, নির্বাচন পরিচালনার ঝুঁকি, নির্বাচন পরিচালনা এবং অর্জিত সাফল্য আজও সিংহভাগ ভারতবাসীর অজানা। ঠিক তেমনি দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার প্রধান পুরোহিত শ্রী সুকুমার সেন আজও এক বিস্মৃত নাম। জীবনের অধিকাংশ সময় প্রশাসনের উচ্চপদে আসীন থাকলেও তাঁর রাজনৈতিক দর্শন কখনও কোনোভাবে তাঁর নিরপেক্ষতাকে প্রভাবিত করেনি। দার্শনিক সুকুমার সেন তাঁর 'জীবন আমায় কি শিক্ষা দিয়েছে' শীর্ষক আত্মকথনে বলেন, "আমার অভিজ্ঞতায় আকাঙ্ক্ষা এবং তৃপ্তির একটি যৌক্তিক সমঝোতাই মানুষের সুখী হওয়ার উপায়।" এই জীবনদর্শনে বিশ্বাসী মানুষ খুব সঙ্গত কারণেই তাই রয়ে গেছেন প্রচারের আলো থেকে সহস্র যোজন দূরে! পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য, যে ব্যক্তির দৃপ্ত পদচারণায় আজ ভারতবাসী প্রকৃত অর্থে 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী' দেশের নাগরিক হিসেবে সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়ে চলেছেন, সেই কৃতিমান মহামানবকে সদ্য অতিক্রান্ত স্বাধীনতার হীরকজয়ন্তী বর্ষে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করার পাশাপাশি তাঁকে 'মরণোত্তর ভারতরত্ন' সম্মানে সম্মানিত করার এমন সুবর্ণ সুযোগ রাষ্ট্র গ্রহণ করবে কি না, তা দেখার বিষয় !

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: *অমৃতবাজার পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকা,* ভারতীয় নির্বাচন আয়োগ, শ্রী দেবদত্ত সেন এবং শ্রী সঞ্জীব সেন।

Tibetan Collection of The Asiatic Society

Archana Ray
Cataloguer (Museum), The Asiatic Society

Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā (Gold)

The Asiatic Society of Kolkata has a fine collection of about 7000 Tibetan Manuscripts, collected from different sources. The Tibetan collection is mainly in three types:

1. The Xylograph printed inside the crudely carved wooden blocks on the handmade paper tough and unpolished.
2. Some manuscripts are written on rough paper by hand.
3. Some printed texts written on modern papers.

Tibetan scriptures are commonly known as Kanjur, the canon and Tanjur, the commentaries. In the Asiatic Society, a complete set of Kanjur is preserved in three editions, i.e. Snār-thāṅ, Peeking and Lhāsā. Tanjur texts are Snār-thāṅ and peeking editions. A few Kanjur Manuscripts are the Tashi-lhuṅ-po edition. In addition to the Tanjur and Kanjur, the Society also possesses 330 texts of the miscellaneous work of the eminent scholars dealing with different subjects and varied interests. Some hand written manuscripts (Bris-mā) are also available in this collection.

Kanjur and Tanjur

Bu-ston (AD 1290-1364), an eminent scholar, collected and translated a few Indian texts scattered throughout the country. He also arranged those texts into two great series, i.e. Kanjur and Tanjur. Those texts were the faithful translations of the Sanskrit books into Tibetan, done between the 7th to 13th centuries AD by the Tibetan Buddhist monks well versed in Sanskrit literature. Almost all the texts of Kanjur and Tanjur collections have Sanskrit titles. Primarily all these were handwritten. In the 13th century, a Tibetan leader brought the art of block printing from China. Handwritten manuscripts and other literature were given

to the block makers. Different monasteries, then, began to prepare separate blocks from the same texts. The Xylograph of Kanjur was prepared in 108 volumes and Tanjur in 225 volumes. The Kanjur consists of 108 volumes arranged in seven principal divisions. The Tanjur is a cyclopaedic compilation consists of 225 volumes. There are two classes of Tanjur, i.e. Tantraṭīkā (rgyud-'grel) and Sūtraṭīkā (mdo-'grel). The Tantraṭīkā is mostly about tantric rituals and ceremonies, found in 87 volumes. The Sūtraṭīkā, in 136 volumes, treats various sciences and literature. One contains hymns of several deities (stotra), while the other volume is the index of the whole. It comprises all sorts of literary works written mainly by ancient Indian Paṇḍits and some learned Tibetans. The two collections contain 4569 texts. It is a tragedy that original compositions were missing except for a few, and nothing could be known about them for centuries.

A complete set of Kanjur and Tanjur text of Buddhist scriptures are preserved in atleast three editions (Lhasa, Narthang and Peeking). Apart from these, we have a miscellaneous work of the eminent scholars dealing with different subjects. From historical and literary point of view these texts are of unique importance for others. These texts throw a light on some information about literary evidence of this land, philosophy, tantra as well as the science of medicine, astrology, mathematics. It contains a number of life stories of Tibetan scholars as well as other scholars who visited India and wrote several books on different aspects of Buddhism, and also some commentaries and notes of eminent scholars of Sanskrit-Buddhist texts. It contains a number of texts on the ancient and medieval history of India and Tibet.

Sources of Tibetan Manuscript

Brian Houghton Hodgson had initiated Buddhist studies in the Asiatic Society. In 1818 he travelled to India as a writer to the British East India Company. Hodgson worked in India and Nepal as a naturalist and ethnologist. He described numerous species of birds and mammals from the Himalayas. At the same time, Hodgson was a scholar of Tibetan Buddhism and wrote extensively on varied topics relating to linguistics and religion. He was a member of the Society from 1833 to 1858 and discovered several Sanskrit-Buddhist manuscripts in Nepal. From 1824 onwards, Hodgson donated 94 Sanskrit-Buddhist Manuscripts to the Asiatic Society. He obtained a collection of Xylographs comprising two complete sets of Tibetan works, i.e. Kanjur and Tanjur printed with wooden blocks in Tibetan handmade papers in the Indian puthi format. The collection contains the whole circle of sacred literature. W.B. Bayley, Vice President of the Society, presented those to the Asiatic Society on 7th July 1824. In 1829, with the sanction of the Governor-General of the Council, the Council of Fort William College handed over a collection of Kanjur and some non-canonical Tibetan Manuscripts to the Society. H. Shakespear, President of the Council of Fort William College, took the initiative to transfer the Tibetan Manuscripts. His recommendation of transfer initiative was honoured by the Government (H.T. Prinsep letter dated 21st July 1829 to H. Shakespeare, President of the Fort William Council, AR No 503,Sl No 14 0f 1829). The Society was requested to receive the delivery of these invaluable materials on 28th July 1829, and thus it became the depository of the Asiatic Society museum. Some Tibetan Manuscripts was brought down by Alexander Csoma de Kőrös too. The Society has also168 printed volumes of the Tibetan Manuscripts (Peeking edition) in the complete sets of Kanjur and Tanjur texts of the Buddhist scriptures, published by the

Tibetan Tripitaka Research Institute (TTRI), Tokyo, Japan. The peeking edition stands as the oldest version in the printed edition. Dalai Lama XIV (Tenzin Gyatso) presented another edition called Lhāsā. Only Kanjur is available in the Lhāsā edition.

The Special Features of Tibetan Manuscripts

The Tibetan Manuscripts appear in the Indian puthi form. They are oblong in size (mainly Snār-thāṅ) and writing on both sides of the folio, and there are more or less 6, 7 or 8 lines on each page. The Xylograph of the Snār-thāṅ edition Kanjur and Tanjur are large and printed in black ink, whereas the Peeking edition appeared in printed book form. The paper used in writing the Manuscripts was the coarse type of Tibetan paper so that the front impression would not disturb the back. Mostly dbu-can scripts are available in the Manuscripts.

The peculiarity of the Tibetan Manuscripts is the folio no. The numerical figures are not used as folio no. Words are used instead of a figure, i.e. 11 is marked by bcu-gcig, 'bcu' means 10, and 'gcig' means one. Notes on margins appear in the Tibetan Manuscripts. It is an important feature. In most of the cases, subject mention in the left-hand margin, the texts dealing with Sū traṭīkā contain the marginal note mdo-'grel. In the cases of indigenous Manuscripts, a text on the biography of eminent personalities has a marginal note as 'rnam-thar'. Another important point on the margin is volume no. In the Tibetan Manuscripts, alphabetical letters are used to indicate the number of the volume. The alphabet 'ka' is used for the 1st volume. It is mentioned on the left-hand margin of each folio and accordingly 'kha' for the 2nd volume and so on.

The Tibetan Manuscripts, bris-mā, (handwritten) contain small paintings of Lord Buddha and Buddhist deities. It became a general practice to give outline pictures or illustrations in the first two or three folios of texts. The outline pictures and illustrations appear on the extreme sides of the first two or three folios. In the colophon of the Tibetan Manuscripts, the name of several Indian scholars and Tibetan interpreters appears with a brief description of their activities.

Eminent Personalities

Eminent scholars like Csoma-de-Kőrös, Sarat Chandra Das have utilized these Manuscripts in the last two centuries. Csoma-de-Kőrös was the first European to have acquired a systematic scholarly knowledge of the Tibetan language. He was associated with the Society from 1831 in his Tibetan studies. On Feb 6 1834, Csoma-de-Kőrös got elected as an honorary member of the Society unanimously. He worked as a Librarian of the Society from May 1838 to April 1841. The first publication was in the 1st volume of the journal (1832) has a short but excellent geographical explanation of Tibet entitled "Geographical notice of Tibet". Csoma-de-Kőrös was the pioneer in analysing the Kanjur, and his works got published in the *Asiatick Researches* (Vol. XX,Pt.1 Pg.41-93 and pt.2 Pg 293-357, 1836-1839). The analysis ventured a new method to present contents of the Kanjur (Buddhavacana) collection preserved in Tibetan for modern scholars. Another important work is the life of Buddha, divided into 12 matters. This article is considered to be advancement in the history of Buddhism. He explained all the main events of Buddha's life as we know them today. He also contributed Sanskrit-Tibetan- English vocabulary is an edition and translation of Mahāvyūtpatti edited by Sir E Denison Ross and Mahāmahopādhyāya Satish Chandra Vidyābhuṣana. In 1834 his work "The Tibetan Grammar and

Dictionary", published by the Society at the expense of the Indian Government, was the first of its kind and are deservedly held in high esteem. The last of his contribution appeared in the 25th volume of the Society's journal entitled "A brief notice of the Subháshita Ratna Nidhi of Saskya Pandita, with extracts and translations by the late M.A. Csoma de Kőrösi".

Another crucial contributor to Buddhist studies was Sarat Chandra Das. He was an eminent Tibetologist and scholar in the 19th century and one of the great Tibetan translators of the sacred Sanskrit texts on Buddhism. He was an associate member of the Asiatic Society of Bengal. He went to Tibet many times. In 1879 for the first time, he went to Tibet and came back in 1881. And then he wrote the most important narrative of a journey of Tashi-lhunpo. At first, it got published in the Government report of the Survey of India department in 1881. The Government of India awarded Sarat Chandra the title of Rai-Bahadur for this achievement. He collected a lot of information about the cultural and social life, religion and politics of Tibet. The Royal Geographical Society of Bengal awarded him the 'Back Premium' in 1887 for his contribution towards geographical researches. He contributed several articles to the proceedings and journals of the Society. The first publication was in 1881 "the contribution on the Religion, History etc. of Tibet". Between 1881and 1907, he wrote 37 valuable papers on different aspects of Tibetan culture, social life, religion and politics, and published in its journal and proceedings. In 1892 he founded the "Buddhist text Society in India" in Calcutta and acted as a secretary of this Society. The last of his long list of contributions contained in the journal (1907) entitled "On the Kālacakra system of Buddhism which originated in Orissa".

First Article on the Tibetan Language

Many eminent scholars delivered interesting and illuminative lectures on Buddhist and Tibetan studies in the Asiatic Society. The journal and proceedings of the Society recorded most of these lectures. "An Account of the journey of Tibet", written by Samuel Turner, was the first article on Tibetan studies, published in 1788 (Asiatic Researches). Then the President of the Society accordingly proposes the name of Mr Turner as a member of the Society and is seconded, Mr Peterson.

A few other publications on Tibetan studies

In the Bibliotheca Indica series, a few works on Tibetan studies were published in 1889-1917. Those are the texts Avadāna-kalpalatā (Sanskrit and Tibetan) Au. Kṣemendra and edited by Sarat Chandra Das, H.M.Vidyabhusana, and Satisa Chandra Vidyabhusana. In1908, the text Sragdharā-Stotram (Bauddha Stotra Samgraha or A collection of Buddhist hymns both Sanskrit and Tibetan), by Bhikṣu Sarvajña Mitra of Kashmir and edited by Satis Chandra Vidyabhusana. In 1917, Satis Chandra Vidyabhusana compiled the text Nyāya-Bindu-Index. It was a bilingual index of Sanskrit and Tibetan with a concordance of the terms occurring in the original text and the Tibetan translation. The Minor Tibetan texts (the song of the Eastern Snow Mountain), with English translation and notes by Johan Van Manen, was published in 1919.

Conclusion

The present essay provides a sketch of the nature and typology of Tibetan manuscripts, focuses on the early research initiatives done on Tibetan studies, and gives a brief idea about the researchers.

Asiatic Society's Exhibition on Rare Manuscripts at the 46th International Kolkata Book Fair, 2023

The Asiatic Society, Kolkata for the first time curated an exhibition on rare manuscripts at the 46th International Kolkata Book Fair 2023 in collaboration with the Publishers & Booksellers Guild held from 31st January to 12th February, 2023. The exhibition comprised display of 48 panels of photographic reproduction of manuscripts with descriptions and audio-visual productions based on two illustrated manuscripts. The rare manuscripts on which the exhibition was focused were from different subjects, scripts, languages and materials dating as early as 7th century CE.

The exhibition represented the rich collection of manuscripts in the museum of The Asiatic Society, Kolkata covering a wide variety of scripts like Early Brahmi, Kharosthi, Nagari, Newari, Gouri, Kutila, Gupta Brahmi, Ranjana, Sarada, etc. On the language side, it included Sanskrit as the pre-dominant language as well as Arabic, Persian, Urdu, Tibetan, regional Indian and South-East Asian languages. The images comprised manuscripts written on wide variety of materials like palm to palmyra leaves, barks of different trees, handmade and machine made papers of various grades. The exhibition portrayed the richness and variety in the textual content of the manuscripts which epitomises India's diverse spheres of life and learning. A collage on Ancient Indian Scripts

on side exteriors of the exhibition stall was of special attraction. The colourful and artistic display of the images of manuscripts with eye-catching typography of the descriptions contributed to the aesthetic appeal of the exhibition.

The exhibition highlighted the role of The Asiatic Society as a repository of human knowledge and its dissemination not only among the scholars and researchers but to the public at large, an attempt which could be defined as 'Manuscripts for the Masses'. The exhibition witnessed a large number of visitors on all the days, a great number of whom were students and young scholars. The visitors were fascinated by the theme and content of the exhibition in its attempt to spread awareness on manuscripts which are precursors to books, a first of its kind in an International Book Fair. The exhibition received great appreciations from the visitors with many of them recording their comments in the visitors' book. The exhibition also received wide press and media coverage.

From Visitors' Book

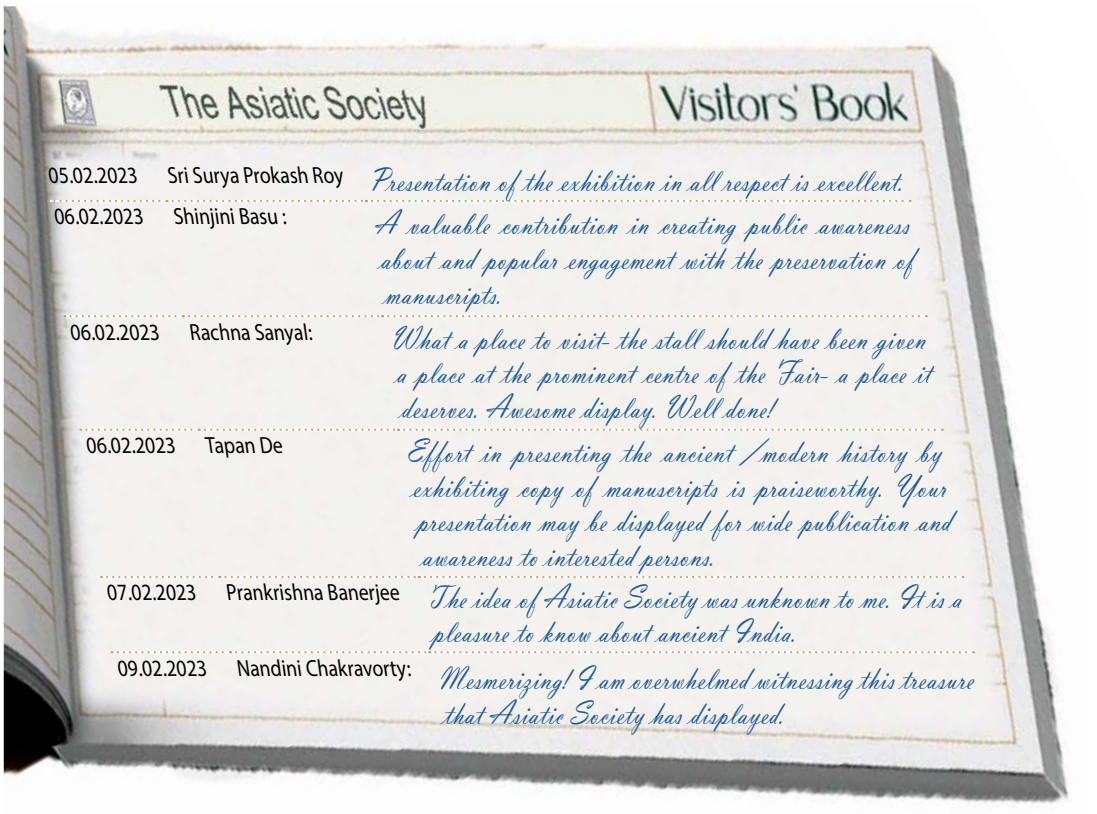

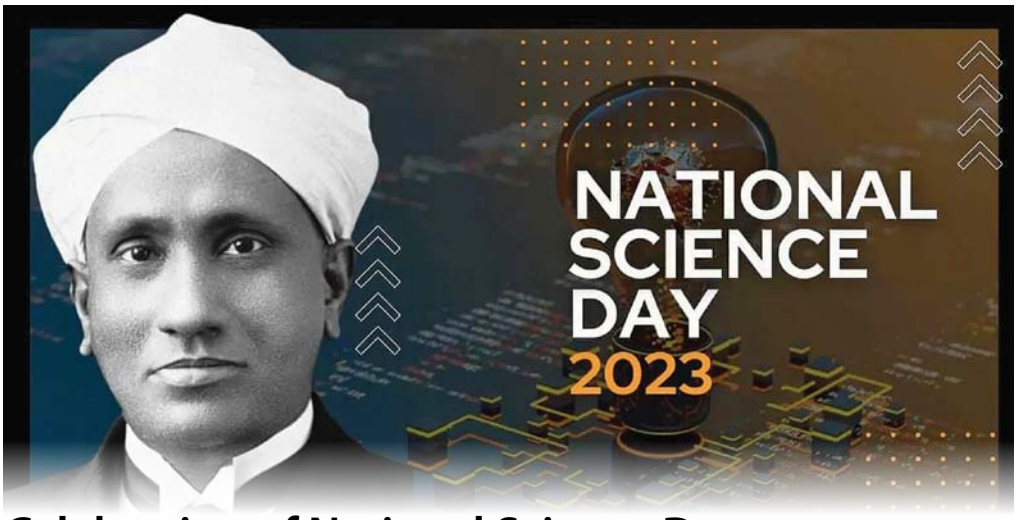

Celebration of National Science Day

The Asiatic Society celebrated the National Science Day on 28th February, 2023. This day was observed as 'Plastic Free Day'. The programme included three Academic Sessions. An exhibition on Sir C. V. Raman was held. Dr. Asok Kanti Sanyal, Biological Science Secretary of the Society was the coordinator of the programme. Professor Basudeb Barman, Vice President of the Society gave the welcome address on that day. Professor Swapan Kumar Pramanick, President of the Society gave an inaugural address. Research Officer-in-Charge Dr. Shakti Mukherji welcomed the guests.

From 3.00 PM the technical session (seminar) was started. Professor Syamal Chakrabarti, Publication Secretary, Dr. Sankar Kumar Nath, Medical Science Secretary and Dr. Raj Kumar Roychowdhury, Physical Science Secretary of the Society were the speakers. Then Keynote address was given by Professor Dhrubajyoti Chattopadhyay, Hon'ble Vice-Chancellor, Sister Nivedita University, Kolkata. At 4.00 PM the panel discussion was started. The topic of discussion was 'Global Science for Global Wellbeing'. Dr. Arunabha Misra, Council Member of the Asiatic Society was the moderator of the panel discussion. After the discussion prize distribution ceremony was held. Many scholars and students from different schools, colleges and universities attended the programme.

L to R : Dr. Asok Kanti Sanyal, Professor Basudeb Barman and Professor Swapan Kumar Pramanick

L to R : Professor Syamal Chakrabarti, Dr. Sankar Kumar Nath and Professor Raj Kumar Roychowdhury

***আহমদ শরীফ রচনাসমগ্র* (প্রথম খণ্ড)**
প্রকাশক : একুশ শতক
মূল্য : ১০০০.০০

তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী—জীবন দর্শনে, ভাবনার পরিসরে, মুক্তচিন্তার প্রবল দার্ঢ্যে, দ্রোহের সাহসিকতায়। আর পাঁচজন ছা-পোষা বাঙালির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিলেন আহমদ শরীফ। বাঙালির ভাবালুতাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে তাকে দাঁড় করিয়েছেন ইতিহাস-নিষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানের সামনে; ক্ষুরধার যুক্তির পারম্পর্যে বরাবর বস্তুবাদকে প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি। বাঙালি এবং মুসলমান—এই জাতিচিহ্নের অস্তিত্ব এবং তার সঙ্কটকে যথার্থ অনুধাবন করেছিলেন আহমদ শরীফ। সেই সঙ্কটের সমাধান নিজেই খুঁজে নিয়েছিলেন আপোষহীন অসাম্প্রদায়িকতায়। ব্যক্তিজীবনে মার্কসবাদী, বিজ্ঞাননিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ, মানবতাবাদী মানুষটি আজীবন 'গতরখাটা' মানুষকে প্রাধান্য দিয়ে গেছেন। তাঁর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অভিধান-সদৃশ গবেষণার মধ্যে, তাঁর পৃথিবীর ইতিহাসের পাঠমালায়, ভারতীয় উপমহাদেশের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির আনুপূর্বিক অন্বেষায় আহমদ শরীফ স্বতন্ত্র। *আহমদ শরীফ রচনাসমগ্র* (প্রথম খণ্ড)---এই স্বতন্ত্র ভাবনার ভাস্কর্যে ঋদ্ধ।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, আহমদ শরীফের রচনার মূল্যায়ন করা বাংলা সাহিত্যের এক সামান্য ছাত্রীর কাছে এক মস্ত পরীক্ষা; দুঃসাধ্যও বটে, দুঃসাহসও বটে। অতএব, এই প্রবন্ধে আহমদ শরীফকে পাঠের অভিজ্ঞতাটুকু তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রথম খণ্ডে সংকলিত গ্রন্থের সংখ্যা ছয়, দুটি *বিদ্যাসুন্দর* কাব্যকে একই বর্গে রাখলে সেই সংখ্যা পাঁচ। প্রথম গ্রন্থ *বিচিত চিন্তা*, প্রকাশিত হয়েছিল ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮। প্রবন্ধের সংখ্যা মোট ৫৪। *বিচিত চিন্তা*-র তিনটি ভাগ। প্রথম—*সাহিত্য চিন্তা*, দ্বিতীয়—*সংস্কৃতি চিন্তা* এবং তৃতীয়—*সাহিত্যিক চিন্তা*। দ্বিতীয় গ্রন্থ *সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা*, ১৯৬৯-এর সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত। এই গ্রন্থের প্রবন্ধ-সংখ্যা ২০। তৃতীয় গ্রন্থ ১৯৭০ সালের জুন মাসে প্রকাশিত *স্বদেশ অন্বেষা*। প্রবন্ধ সংখ্যা ২১। চতুর্থ গ্রন্থ *লায়লী মজনু*—রচনা দৌলত উজির বাহ্‌রাম খানের। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে রচিত এই কাব্যটির পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনা করে ১৯৫৭ সালে গ্রন্থটিকে প্রকাশ করেন আহমদ শরীফ। এই খণ্ডেই সংকলিত হয়েছে দ্বিজ শ্রীধর দাস কবিরাজ বিরচিত *বিদ্যাসুন্দর*, সেই সঙ্গে শা' বারিদ খানের *বিদ্যাসুন্দর*। এই দুটি গ্রন্থেরই পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনার কাজটি করেছিলেন আহমদ শরীফ। অর্থাৎ, প্রথম তিনটি প্রবন্ধগ্রন্থ প্রাবন্ধিকের মৌলিক চিন্তার ফসল, পরের তিনটি গ্রন্থ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সারণীতে আহমদ শরীফের গবেষণালব্ধ বিশিষ্ট সংযোজন। প্রথম খণ্ডের যাবতীয় মৌলিক রচনা ও সম্পাদিত গ্রন্থের সময়সীমা ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ, অর্থাৎ কুড়ি বছরের ভিতরে।

কুড়ি বছর অনেকটা সময়। খণ্ডিত ভারতবর্ষের

একখণ্ড নিয়ে নবগঠিত পাকিস্তানের পূর্বভাগ—পূর্ব পাকিস্তানের একজন নাগরিকের স্বপ্ন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে আত্ম-অন্বেষণের প্রজ্ঞায়। আরও পরে দেশ-কাল-জাতির চাওয়া-পাওয়া-না পাওয়ার আন্দোলনে মথিত দ্রোহকাল ছায়াপাত করেছে লেখকের মানসরাজ্যে। সচেতন পাঠক অবশ্যই খুঁজে পাবেন পরিবর্তনের দিকচিহ্নগুলোকে। তাঁর রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থে যে বিষয়গুলো বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে তার তালিকাটা মোটামুটি এরকম: ১. জাতীয় জীবনে ভাষা। ২. সাহিত্যের নানা দিক—সেখানে বুর্জোয়া সাহিত্য ও গণসাহিত্যের তুলনা যেমন এসেছে, সাহিত্যে আদর্শবাদ বনাম অর্ডিন্যান্সও এসেছে, লোকসাহিত্যের পাশেই আলোচিত ইসলামি সাহিত্যের ধারা, কথাসাহিত্যের সমস্যার পাশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের খসড়াচিত্র। ৩. সাহিত্যিকদের আলোচনা প্রসঙ্গে একাধিক প্রবন্ধে বরাবর আলোচিত রবীন্দ্রনাথ, নজরুল। তবে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে কায়কোবাদ, এমদাদ আলি বা শাহাদাৎ, মোহিতলাল বা বিদ্যাপতি—সকলেই এসেছেন তাঁর আলোচনার বৃত্তে। ৪. ধর্ম কী? তার সঙ্গে মানবসভ্যতার সম্পর্ক কী—ঘুরে ফিরে এসেছে সেই প্রশ্ন। ৫. সংস্কৃতির সংজ্ঞা কী—এ সম্পর্কে বারবার উত্তর সন্ধান করেছেন। ৬. মুসলিম মানসের অনুসন্ধানে বৃত হয়েছেন।

বস্তুত, দ্বিতীয় গ্রন্থ থেকেই 'জাতীয়তা', 'চিন্তা-প্রকাশের স্বাধীনতা' ইত্যাদি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে 'স্বদেশ অন্বেষা' তাঁর শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭০-এ প্রকাশিত *স্বদেশ অন্বেষা*-র যাবতীয় প্রবন্ধের রচনাকাল ১৯৬৮ থেকে '৭০ সালের মধ্যে। সময়ের দিক থেকেও পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে এ ছিল এক ক্রান্তিকাল। রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে এক অসহ ও অসম লড়াই ততদিনে শুরু হয়ে গেছে। এই পর্বের রচনায় স্বদেশ অন্বেষা খুব স্বাভাবিক। অতএব এই পর্বের প্রবন্ধাবলির শিরোনাম সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন—'সংস্কৃতির মুকুরে আমরা', 'বাঙালির সংস্কৃতি', 'বাংলা ও বাঙালি', 'ইতিহাসের ধারায় বাঙালি', 'জাতি গঠনে ভাষার প্রভাব', 'ভাষা প্রসঙ্গে বিতর্কের অন্তরালে', 'ইতিহাসের আলোকে আত্মদর্শন', 'মিলন-ময়দানের সন্ধানে', 'কল্যাণ অন্বেষণ' ইত্যাদি। প্রবন্ধ-নামের তালিকা দীর্ঘ করা অপ্রয়োজনীয়। তবু সত্তা-সন্ধানী পুব বাংলার অধিবাসীদের কাছে সে ছিল বড় কঠিন সময়। আহমদ শরীফ বুঝেছিলেন দেশকালের প্রেক্ষিতে জাতির সামনে আত্মানুসন্ধানের ফসলগুলোকে নতুন করে তুলে ধরার সময় এসেছে, *স্বদেশ অন্বেষা*-র প্রবন্ধগুলোর শিরোনামগুলি সেই ইঙ্গিতই বহন করছে।

এই পর্যন্ত প্রথম খণ্ডের প্রবন্ধাবলির বিষয় বিন্যাসটাই করা হয়েছে। তার সাত-সতেরোর সুলুকসন্ধান দেওয়া এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে অসম্ভব। তবু, কিছু কথা থেকে যায়—সংক্ষেপে হলেও যেগুলির উল্লেখ না করলে বইটির আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রথমত, ভাষা। ভাষা মানুষের আবেগের জায়গা। বিশেষ করে মাতৃভাষা। অধ্যাপক আহমদ শরীফ স্বয়ং বাংলা ভাষা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। সুতরাং ভাষা সম্পর্কে তাঁর চিন্তকসত্তা সর্বদা সজাগ ছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য। ১৩৬৬ সনে (ইং ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে) 'ভাষার কথা' প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, 'ধ্বনি আসলে বোবা। মানুষের অভিপ্রায়ই তাকে অর্থ দান করে। ধ্বনিগুলোর অর্থবহতা একান্তভাবে স্থানিক বা গোত্রিক চুক্তি-নির্ভর। ... যে-লোক যে-ভাষাতে জন্ম থেকেই চুক্তিবদ্ধ হয়, সে-ভাষাই তার মাতৃভাষা। সে ভাষা তার দেহের রক্ত-মাংসের মতই একান্ত নিজের। ... কাজেই ভাষা হচ্ছে মানুষের জীবনানুভূতির বাহন, বেশী করে বললে বলতে হয়, ভাষাই জীবন। তাহলে মাতৃভাষা থেকে বঞ্চিত হওয়া মানে অনেকাংশে জীবনকেই খণ্ডিত করা, ক্ষুদ্র করা, হয়তো বা ব্যর্থ করা।'[১] এই প্রবন্ধ লেখার আগেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। তাকে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বহন করে একটি জাতি তখন প্রহর গুনছে গণমুক্তির। '৬৯-এর নভেম্বরে আহমদ শরীফ জাতির সামনে

নতুন করে তুলে ধরছেন 'জাতি গঠনে ভাষার প্রভাব'-এর কথা। প্রথমেই বলছেন, 'আত্মীয়তা ও ঐক্যের বন্ধন হিসেবে রক্ত-সম্পর্কের পরেই ভাষার স্থান। ... জন্মসূত্রে মানুষ যে ভাষা পায় অর্থাৎ আশৈশব মানুষ যে ভাষায় অভ্যস্ত হয়, সেটিই তার স্বভাষা বা মাতৃভাষা। ঐ ভাষাই তার চেতনার নিয়ামক বলে তার প্রাণেশ্বর হয়ে ওঠে।'[২] জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই একদিকে থাকে তার তাত্ত্বিক দিক, অন্যদিকে প্রায়োগিক দিক। স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পর বাংলা ভাষার প্রায়োগিক দিক নিয়ে চিন্তিত ছিলেন আহমদ শরীফ। *দৈনিক সংবাদকে* দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন— "অফিস-আদালতে বাংলা চালু করার আগে টেলিগ্রাফ, টেলিপ্রিন্টার, সাঁটলিপি, টাইপ-রাইটার প্রভৃতি বাংলা সঙ্কেতে এ ভাষায় দ্রুত কাজ চালানোর মতো করে চালু করতে হবে এবং বাংলাতে এই কাজ করবার মতো কয়েক লাখ মানুষকে প্রশিক্ষণ দান করতে হবে। এই সব ব্যবস্থা না করে গায়ের জোরে বাংলা চালু করতে গেলে অফিসে-অফিসে কিংবা ব্যক্তিগত জীবনে একদিনের কাজ তিনদিনে করতে হবে।"[৩] বস্তুবাদী চিন্তক আহমদ শরীফ চিরদিন এই ভাবেই বাস্তবের মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

সংস্কৃতি কী—এ নিয়ে আজীবন ভেবেছেন প্রাবন্ধিক। ১৯৫৭ সালে 'সংস্কৃতি' প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, "এক কথায় culture-এর কোনো সংজ্ঞা দেয়া চলে না। ... culture বা সংস্কৃতি একটি পরিশ্রুত জীবন-চেতনা। ব্যক্তিচিত্তেই এর উদ্ভব ও বিকাশ। এ কখনো সামগ্রিক বা সমবায় সৃষ্টি হতে পারে না। ... অর্থাৎ এ জাতীয় কিংবা দেশীয় সম্পদ হতে পারে, কিন্তু ফসল হবে ব্যক্তিমনের। কেননা, সংস্কৃতি ও কাব্য, চিত্র ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার মতো স্রষ্টার সৃষ্টি। কৃতিত্ব স্রষ্টার বা উদ্ভাবকের।"[৪] এই লেখার ঠিক এক যুগ পরে 'সংস্কৃতির মুকুরে আমরা' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ লিখছেন, "পরিশীলিত ও পরিশ্রুত জীবনচেতনাই সংস্কৃতি। কুসুমের মতো বিকশিত হয়ে ওঠে সংস্কৃতিবান মানুষের মন। তার আত্মার লাবণ্য তার আচরণ ও কর্মকে দেয় মাধুর্য। ... সংস্কৃতির অপর নাম তাই সৌন্দর্য-অন্বেষা। ... সংস্কৃতির জন্ম হয় ব্যক্তিমনে এবং লালন হয় সামাজিক জীবনে। অর্থাৎ একের সৃষ্টি বহুর অনুকরণে ও অনুসরণে দৈশিক ও জাতিক সম্পদ ও ঐতিহ্য হয়ে ওঠে।"[৫] বঙ্গসংস্কৃতি বা ইওরোপীয় সংস্কৃতি জাতীয় শব্দবন্ধগুলিকে এই সংজ্ঞার নিরিখে উপলব্ধি করা যায়।

আসা যাক আহমদ শরীফের ধর্মকেন্দ্রিক ভাবনার ক্ষেত্রে। ব্যক্তিগত জীবনে মার্কস-এঙ্গেলসপন্থী এই অধ্যাপক ঘোরতর নাস্তিক ছিলেন। তাঁর 'অস্তি'-তে একটাই বোধ কাজ করত—মানবতা। প্রথাবদ্ধ ধর্মভাবনার বিপরীতে থাকার দরুণ চিরকাল ধর্মের ধ্বজাধারীদের সমালোচনার তীক্ষ্ণ শর তাঁকে সইতে হয়েছে। তবু, মৃত্যুর পর জানাজা হয়নি, কবরে কীটের খাদ্য হতে চাননি। আগেই অঙ্গীকারপত্রে সই করেছিলেন, অতএব মৃত্যুর পর চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োজনে দেহদান এবং দুটি চোখ দান করেছিলেন তিনি। তা বলে মুসলমান জাতিসত্তার সন্ধান থেকে বিরত থাকেননি তিনি। ইসলামের ইতিহাসকে উপেক্ষা করেননি। 'ইতিহাস পাঠকের দু'একটি জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "এ যুগের মতবাদের মতোই ধর্মমাত্রেই কোন বিশেষ অঞ্চলের মানুষের বিদ্রোহ-বিপ্লবের দান। ... বিপ্লব-বিদ্রোহের অবসানে দ্রোহীদের জয়ে তাদের পরিকল্পিত ও অনুসৃত নিয়ম-পদ্ধতি ও নীতি-আদর্শ পরিণামে নবধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠা পায়।" ধর্ম নিয়ে মানুষের আবেগেরও অন্ত নেই, বিদ্বেষ-হানাহানিরও অন্ত নেই। আহমদ শরীফ আবেগহীন বিজ্ঞান মনস্কতায় লিখছেন, "স্বদেশে ধর্ম জীবন-চেতনারই প্রতিরূপ। তাই স্বদেশে যে নতুন ধর্ম practice, দেশান্তরে তা theory মাত্র। স্বদেশে যা real, দেশান্তরে তা-ই ideal এবং কালান্তরে তা একটা idea, একটা কল্পনাসাধ্য philosophy-র বেশী নয়।"[৬] অথচ মানুষ জাতির নামে, ধর্মের নামে, রাষ্ট্রের নামে, জাতীয়তাবাদের নামে ক্রমশ পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সমাজ-ধর্ম,

জাতি, রাষ্ট্র একদা তৈরি হয়েছিল মানবকল্যাণে। পরিণতি পেল মানববিদ্বেষে। 'স্বাতন্ত্র্য' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ দুঃখ করে লিখছেন, "সমাজে-ধর্মে-জাতে-রাষ্ট্রে অভিন্ন না হলেই সন্দেহ করতে হবে, শত্রু ভাবতে হবে—এই হচ্ছে মানুষের কয়েক হাজার বছরের উদ্যোগ-আয়োজন-আড়ম্বরের ফল। মনুষ্য সাধনার কি মর্মান্তিক ব্যর্থতা, মানব মনীষার কি বিস্ময়কর অপচয়। ... তাই পরধর্মে ঘৃণাই ধার্মিকতা, বিজাতি-বিদ্বেষই জাতীয়তা, পরমত-অসহিষ্ণুতাই আদর্শনিষ্ঠা, সংস্কারাচ্ছন্নতাই সমাজানুগত্য, বিদেশী-বিমুখতাই স্বদেশপ্রীতি আর পরশ্রীকাতরতাই রাষ্ট্রচেতনা নামে প্রশংসিত।"[৭] বাঙালি জাতিসত্তার জমি খুঁজতে গিয়ে 'স্বদেশ, স্বভাষা ও স্বাজাত্য' প্রবন্ধে লিখছেন, "আমরা প্রায় সবাই বাঙালি-মুসলমান, —একথা অস্বীকার করবার জো নেই! আমাদের স্বভাবে, সামাজিক সংস্কারে, জীবনবোধে, সর্বোপরি আমাদের নৃতাত্ত্বিক নিদর্শনে আমাদের এই বাঙালিয়ানার ছাপ রয়েছে পুরোপুরি। আবার আমরা ধর্মাদর্শে আরবের অনুসারী।... তাই ইসলাম বরণ করে তারা ছেড়েছিল হিন্দুয়ানি, অবজ্ঞা করেছিল—ভুলতে চেষ্টা করেছিল হিন্দু-ঐতিহ্যকে, কিন্তু ছাড়েনি স্বভাষা ও সাহিত্যের চর্চা।"[৮] কোথাও বঞ্চনার ব্যথাও বেজেছে তাঁর লেখায়। তিনি ইতিহাসের দর্পণে দেখিয়েছেন ৭০০ বছরের সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনকালে হিন্দুরা উচ্চপদে বসেছে, ধর্মান্তরিত এদেশীয় মুসলমানদের তাঁরা কোনদিনই প্রাধান্য দেননি।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বাঙালির আবেগ নতুন নয়, আহমদ শরীফও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে যুক্তিনিষ্ঠ প্রাবন্ধিক ব্যক্তিপূজার আড়ম্বরে রবীন্দ্রনাথকে দেবত্বের বলয়ে হারিয়ে যেতে দেননি। 'সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রবীন্দ্রমনীষা' প্রবন্ধের গোড়াতেই তিনি লিখলেন, "রবীন্দ্রনাথ এক আশ্চর্য মানুষ। জীবন-প্রভাত থেকে মৃত্যু-মুহূর্ত অবধি তিনি নব নব রূপে বিচিত্র অনুভবে নিজেকে রচনা করে গেছেন।" আর এই প্রবন্ধের শেষ করেছেন এই বলে, "আজকের সংস্কৃতিবান-মানবতাবাদী বাঙালি মাত্রই রবীন্দ্রনাথের মানস-সন্তান।"[৯] সেই সঙ্গে তাঁর ব্যর্থতার দিকগুলোও এক এক করে তুলে ধরেছেন প্রাবন্ধিক। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের অদ্বৈতবোধ Mysticism বলে সমালোচিত। তাঁর যুগচেতনা ও যুগসমস্যা কবির 'স্বাপ্নিক-কাঙ্ক্ষা বলে স্বদেশেও অবহেলিত বলে আহমদ শরীফ মনে করতেন। তাঁর কথায়, "কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্য তিনি যা কিছু করেছেন ও করতে চেয়েছেন, তা কৃষকদের মধ্যেও সমাদৃত হয়নি।"[১০] 'রবীন্দ্রমানসের স্বরূপ-সন্ধানে' প্রবন্ধে পাশ্চাত্য রবীন্দ্র-গ্রহণযোগ্যতা কোথায় কোথায় আর কোন্ কোন্ সৃষ্টিকর্মে সে গ্রহণযোগ্যতা নেই এবং কেন নেই, সেই কারণ বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে আছে তাঁর রবীন্দ্র-বিমুগ্ধতার কথা। তিনি লিখছেন, "সংস্কৃতি আলঙ্কারিকেরা কাব্যাস্বাদনকে ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর বলেছেন। তেমন মহৎ কাব্যরস রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষায় আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। আমাদের এ সৌভাগ্যের তুলনা নেই। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের ঋণের ও কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। জয়তু রবীন্দ্রনাথ।"[১১] বলেছেন বটে, তৎসত্ত্বেও তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'বুর্জোয়া মানবতার প্রতীক'[১২] বলে মনে করতেন।

নজরুল ইসলামকে নিয়ে তাঁর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রথম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। নজরুল সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন—"নজরুলের মন ছিল সরল, বুদ্ধি ছিল ঋজু, আত্মা ছিল অনাবিল। তিনি যা চেয়েছেন সহজভাবেই তা বলেছেন, যা ভেবেছেন তাতে কোনো কূটসমস্যা নেই, জটিল যুক্তিজাল নেই।"[১৩] একে একে তুলে ধরেছেন নজরুলের যুগন্ধরতা, তাঁর কাব্যপ্রেরণার উৎস, তাঁর কাব্যসাধনার লক্ষ্য। তবে চমৎকৃত হতে হয় 'নজরুল ইসলাম ঃ এক বিরূপ পাঠকের দৃষ্টিতে' প্রবন্ধপাঠে। এক বন্ধুর বকলমে তিনি লিখেছেন "নজরুল বিদ্রোহী নন, তিনি মুজাহিদ। তিনি মানবতার কবি নন, নির্যাতিত মানবতার কবি। তিনি পাকিস্তানের জাতীয় কবি হতে পারেন না। তাঁর

জীবনচর্যায় মুসলমানীর চেয়ে অনেক বেশি আছে হিন্দুয়ানি। ইত্যাদি, ইত্যাদি...।" এই প্রবন্ধের শেষ অবশ্য স্তুতিবাদেই। ব্যাজস্তুতি বলে অলঙ্কার শাস্ত্রে একটি বিষয় আছে, যেখানে প্রশংসার ছলে নিন্দা আর নিন্দার ছলে প্রশংসা করা হয়। এই প্রবন্ধের চলন অনেকটা সেরকমই।

একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করতেই হয়, প্রবন্ধটির নাম 'পদাবলী ঃ কাম ও প্রেম'। পাঠ শেষে মনে পড়ে গেল কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতার দু'টি চরণ—

"প্রেম বলে কিছু নাই
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে
সব সমাধান পাই।"

আহমদ শরীফ একদিকে বিজ্ঞানমনস্ক, অন্যদিকে ফ্রয়েডীয় দর্শন-স্নাত। ফলে প্রবন্ধের শুরুতেই তাঁর ঘোষণা—"তত্ত্ববিদের চোখে যা-ই হোক, সাধারণের অনুভবে কামে ও প্রেমে পার্থক্য সামান্য এবং বিজ্ঞানীর চোখে দু-ই নিরেট জৈবিক-বৃত্তি।" এই প্রবন্ধের কিছু বিচ্ছিন্ন অংশ এইরকম : "সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশেষ স্তরে জীবনের ক্ষেত্রে এ আদিরসের বিচিত্র ও বহুধা প্রভাব স্বীকার করে ধন্য হয়েছে মানুষ, ধন্য করেছে দেবতাদের। গ্রীক ও হিন্দুপুরাণ তার সাক্ষ্য।" "পরকীয়াতেই প্রেমের স্ফূর্তি।... ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ, কৃষ্ণ-নিপ্পিনাই বা রাধা-কৃষ্ণ—এই প্রেম প্রকাশের আদর্শ ও বিকাশের অবলম্বন হয়ে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে মানুষের মনে আকুতি মিটিয়েছে।"[১৪] মানতেই হবে রবীন্দ্রনাথের প্লেটোনিক লাভের ভাবের জগতে ভাসমান বাঙালি মননের রুচিশীলতায় এ ছিল প্রায় মিসাইল হানা। ধারে ভারে ভাবে ভাবনায় 'কল্লোলীয়' বলে অনায়াসে এক পংক্তিতে রাখা যায় আহমদ শরীফকে। ১৯৭৪-এর ফেব্রুয়ারিতে এক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—"আপনার ছেলে যদি আপনার সামনে ধূমপান করে, তাহলে আপনি কি করবেন?" জবাবে তিনি বলেছিলেন, "এ সব ব্যবস্থা চালু হয়েছিল সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা হিসেবে। সে দিন শেষ হয়ে গিয়েছে।" প্রশ্ন : "আপনি কি মনে করেন তরুণ তরুণীদের অবাধ মেলামেশা সমাজকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে?" উত্তর : "অবাধ মেলামেশার সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে। অস্বাভাবিক অবস্থায় কেউ থাকতে পারে না। তাই পতিতাবৃত্তির জন্ম। মহাকাব্যগুলোও নারী হরণ দিয়েই শুরু।... নারীসঙ্গ মানুষের জীবনকে সহজ করে।"[১৫] এই দ্ব্যর্থহীন বাস্তবতাতেই আহমদ শরীফ ব্যতিক্রমী।

বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকমাত্রেই জানেন, অধ্যাপক ড. আহমদ শরীফ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গবেষণাক্ষেত্রে এক খনি। হাজারের ওপর লেখা প্রবন্ধে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি প্রত্যন্ত কোণার খোঁজ দিয়েছেন তিনি। সম্পাদনা করেছেন অজস্র পুথি। তাঁর পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সাহচর্যে পুত্রবৎ বড় হয়েছিলেন আহমদ শরীফ। তাঁর অনুপ্রেরণা তো ছিলই, সঙ্গে মিশেছিল আশ্চর্য মেধা। পাশ্চাত্য দর্শনের আলোকে নতুন পথের দিশা পেয়েছিলেন, সঙ্গে ছিল প্রাচ্যের মানস। সবে মিলে তৈরি হয়েছিল আহমদ শরীফের দীপ্ত মনীষা। তাঁর মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য* মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আলোচনার অনন্য গ্রন্থ। তাঁর রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে সংকলিত 'লায়লী-মজনু' এবং 'বিদ্যাসুন্দর'-এর দুটি পৃথক কাব্যের মূল পাঠ ও তার আলোচনা নিঃসন্দেহে মধ্যযুগের গবেষকদের কাছে মূল্যবান প্রাপ্তি। আগ্রহী পাঠকও পাবেন মধ্যযুগের দুটি প্রেমোপাখ্যানের স্বাদ।

আহমদ শরীফ রচনাসমগ্র সম্পাদনা করেছেন ড. প্রথমা রায়মণ্ডল, সহযোগী সম্পাদক ড. চিত্ত মণ্ডল। প্রকাশক : একুশ শতক। পশ্চিমবঙ্গে আহমদ শরীফের রচনাবলীকে সহজলভ্য করার জন্য প্রথমেই এঁদের সকলের সাধুবাদ প্রাপ্য। অতি যত্নের সঙ্গে কোন নিয়মের অনুবর্তন করে সম্পাদনা করা হয়েছে, কোন নিয়ম বর্জন করা হয়েছে, সে কথা অনুপুঙ্খে জানিয়েছেন সম্পাদক। সূত্রাকারে সন

তারিখ সহ আহমদ শরীফের জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে। সংকলিত হয়েছে গ্রন্থপঞ্জি, সমকালে অগ্রন্থিত রচনা। এত বৃহৎ কর্মকান্ডে হাত দেওয়াই এক মস্ত চ্যালেঞ্জ, তাকে সুচারুরূপে সম্পাদন করা অভিবাদনযোগ্য। তবু দু'চারটি কথা থেকে যায়। যদিও শিরোনাম-সূচি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পৃষ্ঠা সংখ্যার উল্লেখ না থাকায় প্রবন্ধ খুঁজে পেতে সমস্যা হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে প্রতিটি প্রবন্ধের পৃষ্ঠাসূচি সংযোজন জরুরি। প্রবন্ধগুলি কালানুক্রমিক ধারায় বিন্যস্ত হওয়া দরকার ছিল। 'একটি প্রতারক প্রত্যয়' প্রবন্ধের শেষে উল্লিখিত তারিখ : ৫.১০.১৯৭০ এবং ৬.১০.১৯৭০ নিঃসন্দেহে মুদ্রণপ্রমাদ। কিন্তু একই প্রবন্ধের উল্লেখে ৭০১ নম্বর পৃষ্ঠায় রচনাকাল লেখা হয়েছে ৫ ও ৬ জানুয়ারি, ১৯৭৯। সালটি সম্বন্ধে প্রশ্নচিহ্ন রইল।

আহমদ শরীফ একদা বলেছিলেন—"নাস্তিক দর্শনের মূল কথা হচ্ছে জ্ঞান-যুক্তি-বুদ্ধি। সাহসী মানুষই নাস্তিক হন।"[১৬] ফলে মৌলবাদীদের চোখে তিনি ছিলেন 'মুরতাদ'। ঢাকার রাস্তায় তাঁর ফাঁসির দাবিতে পোস্টার পড়েছিল। 'মুরতাদ' অর্থে ধর্মত্যাগী। তিনি বলেছিলেন—"নিজে কোনদিন ধর্মগ্রহণ করিনি, সুতরাং ত্যাগের প্রশ্ন ওঠে না।"[১৭] শেষ পর্যন্ত বলে গেছেন, "এখনও মার্কসবাদই শেষ কথা।" স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পরও মুক্তিচিন্তার ক্ষেত্র অপ্রশস্ত বলে বারবার সরব হয়েছিলেন কবি। প্রতিটি জমানাতেই সরকারের সমালোচনায় মুখর ছিলেন অসীম সাহসী এই মানুষটি। শেষ পর্যন্ত আপোষহীন এই মনস্বীর রচনাবলীর অন্য খণ্ডগুলি প্রকাশের অপেক্ষা রইল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

আহমদ শরীফ—*সাক্ষাৎকারে সময়কাল*
কোরক ঃ বাঙালি মুসলমান : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব সংখ্যা

উল্লেখপঞ্জি :

১. *আহমদ শরীফ রচনাসমগ্র* (প্রথম খণ্ড), পৃ. ১৭
২. ঐ, পৃ. ৩৬০
৩. আহমদ শরীফ—*সাক্ষাৎকারে সময়কাল*, পৃ. ১৩-১৪
৪. *আহমদ শরীফ রচনাসমগ্র* (প্রথম খণ্ড), পৃ. ১৫২
৫. ঐ, পৃ. ৩৪৫
৬. ঐ, পৃ. ২৫১
৭. ঐ, পৃ. ১৩৯-১৪০
৮. ঐ, পৃ. ১৩১
৯. ঐ, পৃ. ১৮৭
১০. ঐ, পৃ. ১৮৬
১১. ঐ, পৃ. ১৯৩
১২. আহমদ শরীফ—*সাক্ষাৎকারে সময়কাল*, পৃ. ২৩
১৩. *আহমদ শরীফ রচনাসমগ্র* (প্রথম খণ্ড), পৃ. ২০৭
১৪. ঐ, পৃ. ৪৩৮
১৫. আহমদ শরীফ—*সাক্ষাৎকারে সময়কাল*, পৃ. ৩৭
১৬. ঐ, পৃ. ২১২
১৭. ঐ, পৃ. ২৭৭

স্মৃতিকণা চক্রবর্তী
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ, কলকাতা

Books processed during the Last Month

Ban
320.83095414
S941s

সুব্রত বাগচী

সুভাষচন্দ্র পৌরচিন্তা/সুব্রত বাগচী। — কলকাতা : লোকমত প্রকাশনী, ২০২২।

৪৪২পৃ.; ২২ সেমি **(B15954) (05.09.22)**

মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা

Ban
333.315414
T261

তেভাগা আন্দোলন;

সম্পাদনা ধনঞ্জয় রায়। — কলকাতা : আনন্দ, ২০১৯।

২৫৬পৃ.; ২২ সেমি **(B68129) (23.12.21)**

ISBN : 978-81-7756-069-5

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

Ban
398.2
S194k

সাঁওতাল লোককথা ঃ

পল ওলাফ বোডিং এর 'সান্তাল ফোক টেলস'-এর বাংলা তর্জমা/সম্পাদনা কুমার রাণা ও সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত, বাংলা রূপান্তর জয়া মিত্র, প্রীতম মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদকদ্বয়। —কলকাতা ঃ দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০২২।

২৮,৩৭৬পৃ.; ২৫ সেমি **(B16060-65) (26.10.22)**

ISBN : 978-81-956198-7-0

মূল্য : ৮০০.০০ টাকা

Ban
500
B212s
6c

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা (১৮১৮-১৮৬০);

সম্পাদনা শরদিন্দু শেখর রায়। —২য় সংস্করণ; ভূমিকা সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। — কলকাতা ঃ ২য় সংস্করণ, ২০২২।

৬৪,৭৬৮পৃ.; ২২ সেমি **(B16096-B16101)**

ISBN : 978-81956806-2-7

মূল্য : ১২০০.০০ টাকা

Ban
635.9772
B575b

ভগীরথ মিশ্র

বনসাই চর্চা/ভগীরথ মিশ্র। — কলকাতা : দে'জ, ১৪১২।

১০০পৃ.; ২২ সেমি **(B15990) (25.09.22)**

সাইকেই ও সুইসেকি সহ।

Ban
891.2103
M214d

ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

মহাভারতের একশোটি দুর্লভ মুহূর্ত/ধীরেশচন্দ্র ভট্টচার্য। — কলকাতা : আনন্দ, ২০২১।

৬৭৪পৃ.; ২৫ সেমি **(BN68156) (03.11.22)**

ISBN : 9788177566505

মূল্য : ৭০০.০০ টাকা

Ban
891.2103
M214d

ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

মহাভারতের নারী/ধীরেশচন্দ্র ভট্টচার্য। — কলকাতা : আনন্দ, ২০২২।

১৬,৩৬৪পৃ.; ২৫ সেমি **(BN68157) (03.11.22)**

নির্ঘণ্ট ঃ পৃ. ৩৫৭-৩৬৪

ISBN : 9788177569100

মূল্য : ৬০০.০০ টাকা

Ban
891.44109
R116s.c

সত্যজিৎ চৌধুরী

চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ ঃ অগ্রন্থিত প্রবন্ধ সংগ্রহ/সত্যজিৎ চৌধুরী; বিজলী সরকার সম্পাদিত। — হাওড়া : আচমন, ১৪২৯।

২২৮ পৃ.; চিত্রসহ; ২৩ সেমি **(B15992) (28.09.22)**

Ban
920
S724b

সৌরীশ চক্রবর্তী

ভারতীয়দের পদবীর অভিধান (সংক্ষিপ্তাকারে)/সৌরীশ চক্রবর্তী। — কলকাতা : আনন্দ প্রকাশন, ২০১২।

১৫+১৯২ পৃ.; ৪পৃ. চিত্র; ২২ সেমি **(B15955) (05.09.22)**

নির্ঘণ্ট ঃ পৃ. ৩৫৭-৩৬৪

ISBN : 978-93-81683-07-1

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

Ban
954.025
R196b

রঞ্জিত সেন

ভারতীয় ইসলাম ঃ একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা/রঞ্জিত সেন। — কলকাতা : রূপালী, ২০২২।

১৬৮পৃ.; ২২ সেমি **(B16119) (08.12.22)**

নির্ঘণ্ট ঃ পৃ. ৩৫৭-৩৬৪

ISBN : 978-93-81669-25-9

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

OUR LATEST PUBLICATIONS

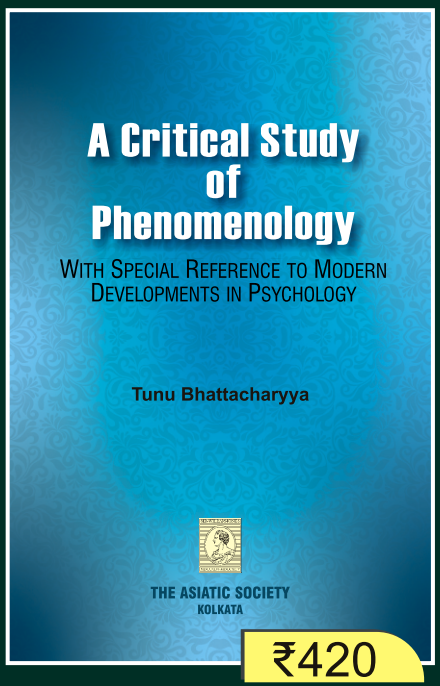

₹420

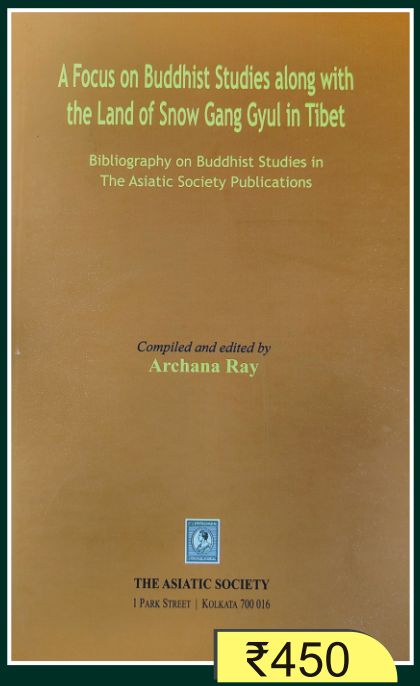

₹450

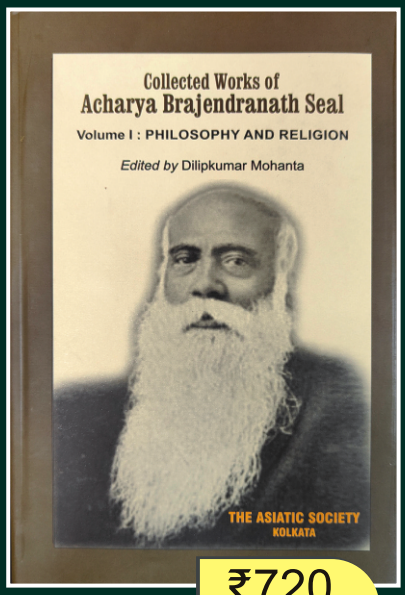

₹720

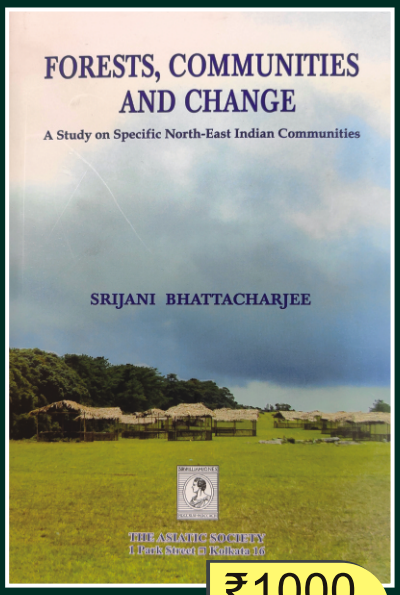

₹1000

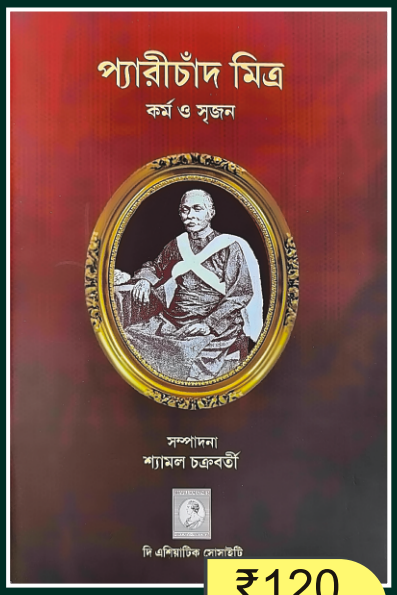

₹120

OUR LATEST PUBLICATIONS

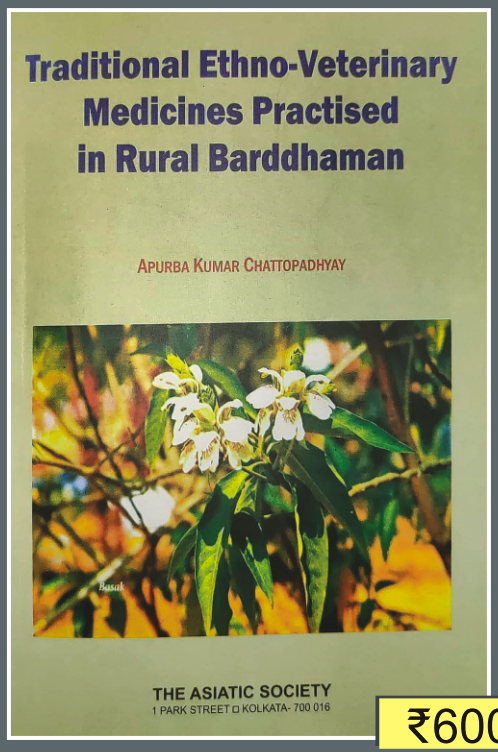

₹600

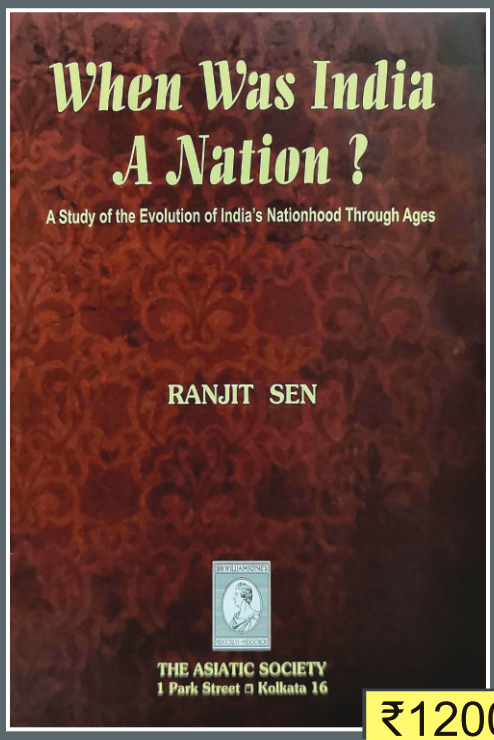

₹1200

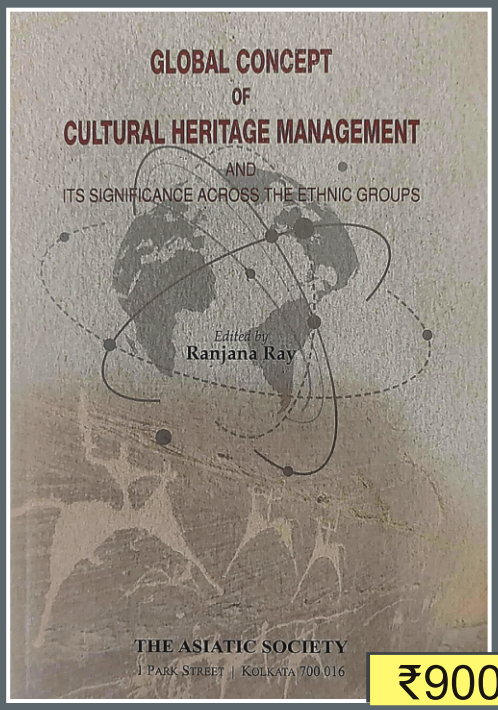

₹900

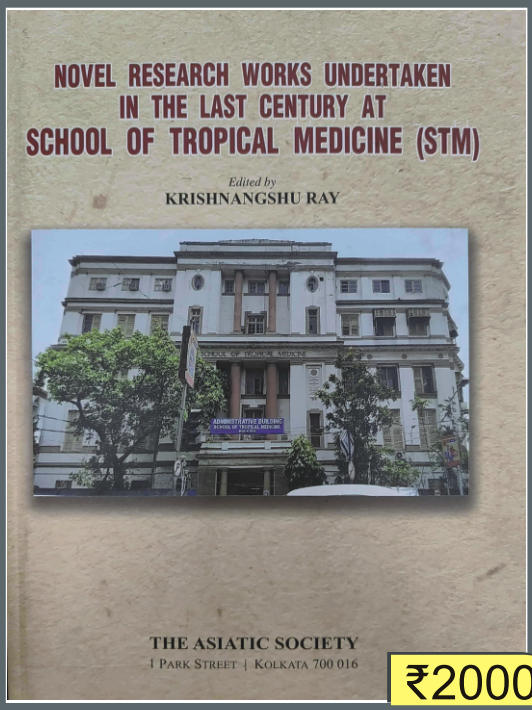

₹2000

Published by Dr. Satyabrata Chakrabarti, General Secretary, The Asiatic Society, 1, Park Street, Kolkata 700016,
Phone: 2229 0779, 2229 7251, 2249 7250 E-mail : gs.asiatic@gmail.com
Web: www.asiaticsocietykolkata.org
Printed at Arunima Printing Works, 81, Simla Street, Kolkata 700 006. E-mail : arunimaprinting@gmail.com